ড. অতুল সুর
হিন্দু
সভ্যতার
নৃতাত্ত্বিক
ভাষ্য

হিন্দু সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য

বই ও লেখক

গ্রন্থটি ছাত্র সমাজ ও সাধারণ পাঠকের জন্য লিখিত। লেখক পশ্চিমবঙ্গ সরকার-কর্তৃক 'রবীন্দ্র পুরস্কার'-দ্বারা সম্মানিত। ৯৫ বৎসর বয়সকালের মধ্যে অসংখ্য গ্রন্থ এবং দশ সহস্রাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন।

বর্তমান শতাব্দীর বিশের দশকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন নৃতত্ত্ব বিষয়ে পঠন-পাঠন শুরু হয় তখন প্রথম যে ছাত্রগোষ্ঠী ওই বিষয়ে অধ্যয়নে রত হন, অতুল সুর তাঁদের অন্যতম। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে নৃতত্ত্বে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম.এ.পাশ করেন। অর্থনীতিতেও ডি. এস-সি উপাধি লাভ করেছেন।

নৃতত্ত্ব বিষয়ে ওঁর গবেষণা-লব্ধ প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় 'ম্যান ইন ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে। ১৯২৯ থেকে ১৯৩১ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈতনিক গবেষকের কাজে নিযুক্ত থাকেন। ভারতের প্রত্নতত্ত্ব সমীক্ষার অধিকর্তা সার জন মারশালের আহ্বানে মহেঞ্জোদারোয় যান ও প্রমাণ করেন যে পরবর্তীকালের হিন্দুসভ্যতার গঠনে বারো আনা ছিল সিন্ধুসভ্যতার অবদান।

গ্রন্থকার রবীন্দ্র পুরস্কার ব্যতীত পেয়েছেন মাইকেল মধুসূদন পুরস্কার, রামমোহন পুরস্কার, সুশীলাদেবী বিরলা পুরস্কার, বিবেকানন্দ পুরস্কার এবং CCI Award ইত্যাদি।

হিন্দু সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য

ডঃ অতুল সুর

সা হি ত্য লো ক
৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। কলকাতা ৬

Hindu Sabhyatar Nritattik
Bhashya
by Dr. Atul Sur

প্রথম প্রকাশ : ১৯৮১। দ্বিতীয় মুদ্রণ : ১৯৮৪
তৃতীয় মুদ্রণ : ১৯৯৮
চতুর্থ মুদ্রণ : মাঘ ১৪১৮। ফেব্রুয়ারি ২০১২

প্রচ্ছদ : অমিয় ভট্টাচার্য

প্রকাশক : নেপালচন্দ্র ঘোষ
সাহিত্যলোক। ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। কলকাতা ৬

মুদ্রাকর : নেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স। ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। কলকাতা ৬

ISBN : 81-86946-12-8

বিক্রয় কেন্দ্র
সাহিত্যলোক। বিদ্যাসাগর টাওয়ার
১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
শপ নং. এ-২২। কলকাতা ৭৩

চল্লিশ টাকা

পরমারাধ্যা মাতৃদেবীর
শ্রীচরণে

সূচী

১

নৃতত্ত্ব ও হিন্দুসভ্যতা

লেভি-স্ট্রাউস (Claude Levi-strauss) জগতের একজন সেরা নৃতত্ত্ববিদ। তিনি বলেন—"নৃতত্ত্ববিদরা হচ্ছে একটা অদ্ভুত জাত। তাঁরা 'পরিচিত' বিষয়বস্তুকে রহস্যময় ও জটিল করে তোলেন।" ("Anthropologists are a strange breed, they like to make even the 'familiar' look mysterious and complicated.")। কিন্তু প্রকৃতই কি তাঁরা 'পরিচিত' বিষয়বস্তুকে জটিল করে তোলেন? তা নয়। তাঁরা পরিচিত বিষয়বস্তুকে নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি (সেই দৃষ্টিভঙ্গিটাই সাধারণ লোকের কাছে রহস্যময় ও জটিল) দিয়ে বিচার করে তাদের প্রকৃত পরিচয় দিতে চান। নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক জোসেফ ব্রাম বলেন যে পৃথিবীতে আবির্ভাবের দিন থেকে মানুষ যে শুধু বেঁচে থাকবার চেষ্টা করেছে তা নয়, সে তার জীবনচর্যা-প্রণালীকে নিয়ত পর্যবেক্ষণ করেও এসেছে। ("Men have always tended not only to live, but at the same time to observe themselves living.") বস্তুত মানুষ হচ্ছে অন্তর্দর্শী, চিন্তাশীল ও আত্মসচেতন জীব। মানুষের এই স্বভাবজাত প্রকৃতি বিশ্লেষণ করাই নৃতত্ত্ববিদগণের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধন করতে গিয়ে নৃতত্ত্ববিদরা এক মহান তত্ত্বে উপনীত হয়েছেন। তাঁদের সে তত্ত্ব অনুযায়ী জগতের যে কোন জাতির জীবনচর্যার সঙ্গে অপর কোন জাতির জীবনচর্যার মধ্যে উত্তম-অধম কোন সম্পর্ক নেই। সকল জাতির জীবনচর্যারই একটা স্বকীয় অর্থবহ ভিত্তি আছে। এই ভিত্তিটার মধ্যে অনেকটা কার্য-কারণ সম্পর্ক আছে। বিংশ শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ নৃতত্ত্ববিদ লন্ডন স্কুল অভ্ ইকনমিক্স-এর সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের অধ্যাপক প্রয়াত ব্রনিসল ম্যালিনাউস্কি তাঁর functional theory দ্বারা এটা প্রমাণ করেছেন। তাঁর এই theory অনুযায়ী প্রত্যেক জাতির জীবনচর্যার প্রতি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত প্রতি অংশেরই একটা বিশেষ অর্থ আছে। নৃতাত্ত্বিক দৃটিভঙ্গি নিয়ে যদি আমরা তার আলোচনা ও বিশ্লেষণ করি, তাহলে আমরা পরস্পরকে বুঝবার চেষ্টা করব ও ঘৃণা করা থেকে নিবৃত্ত থাকব।

মানবীয় জগতে যখনই আমরা মানুষের কোন কর্মপ্রচেষ্টা বা ঔদাসীন্য সম্বন্ধে আলোচনা করি, তখনই আমরা মানুষের একটা স্বভাবজাত ভাবমূর্তি (nature) সামনে রেখে সেই বিষয় সম্বন্ধে বিচার করি। কিন্তু যুগ যুগ ধরে মানুষের এই 'প্রকৃতিজাত স্বভাব', দার্শনিক, মনস্তত্ত্ববিদ ও জীবতত্ত্ববিদগণকে আলেয়ার আলোর মতো বিব্রত করেছে। কিন্তু নৃতত্ত্ববিদগণ নিজেদের এরূপভাবে বিব্রত হতে দেননি। তুলনামূলক আলোচনার ভিত্তিতে তাঁরা এই প্রকৃতিজাত স্বভাববিশিষ্ট basic man'-কে আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেছেন। বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতির তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন পরিবেশে 'basic man ক্রমাগতই পরিবর্তিত হয়েছে। এই পরিবর্তন-প্রক্রিয়া এখনও চলেছে। সেজন্য আমরা একই নরগোষ্ঠীকে (racial group) বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন 'স্বভাব' (nature) প্রকাশ করতে দেখি। এক কথায় যাকে আমরা মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাব বলি, তা কখনও শূন্যতার মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় না। সবসময়ই এর নোঙর বাঁধা থাকে কোন বিশেষ যুগের বিশেষ সংস্কৃতির সঙ্গে।

নৃতত্ত্ববিদগণ যখনই কোন সংস্কৃতির আলোচনা ও অনুশীলন করেন, তখনই তাঁরা সেই সংস্কৃতির অনেক পরিচিত জিনিস সম্বন্ধে অনেক উদ্ভট প্রশ্ন তোলেন। সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে এসব প্রশ্ন উদ্ভট বটে, কেননা যুগ যুগ ধরে মানুষ সেইসব পরিচিত জিনিস সম্বন্ধে সেরূপ কোন প্রশ্ন তোলেনি। কিন্তু সেইসব প্রশ্নের মধ্যেই নিহিত আছে, অতি গভীর রহস্যময় ও জটিল অর্থ।

এরূপ অনেক জটিল প্রশ্ন আমি এই বইয়ে তুলেছি, যা সাধারণ পাঠকের মনে উৎকট কৌতূহল সৃষ্টি করবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে করুন, আমি প্রশ্ন তুলেছি—"তথাকথিত আর্যদের মধ্যে বড় বড় পণ্ডিত থাকা সত্ত্বেও বেদ সংকলন ও পুরাণ, মহাভারত প্রভৃতি রচনার গুরুত্বপূর্ণ কাজ একজন অনার্য রমণীর জারজ সন্তানের ওপর ন্যস্ত হয়েছিল কেন?" আবার প্রশ্ন তুলেছি—"স্বামীকে 'আর্যপুত্র' বলে সম্বোধন করা হত কেন?" আমি আরও দেখিয়েছি যে অম্বষ্ঠ ও চণ্ডাল, এদের দুজনের দেহেই সমান ব্রাহ্মণ রক্ত থাকা সত্ত্বেও একজনকে সমাজের ওপর তলায় ও অপর জনকে নীচের তলায় স্থান দেওয়া হয়েছিল।

নৃতত্ত্ববিদগণ বলেন যে, যখন কোন বিশেষ নরগোষ্ঠীর জীবনচর্যা কোন এক বিশেষ খাতে প্রবাহিত হয়, তখন আমরা তাকে সেই জাতির 'সভ্যতা' বলি। সুতরাং হিন্দুসভ্যতা বলতে আমরা বিশেষ খাতে প্রবাহিত হিন্দুসমাজের জীবনচর্যা বুঝি। যেহেতু সমাজ কোন এক বিশেষ স্থানে দাঁড়িয়ে থাকে না এবং কালের আবর্তনের সঙ্গে তার বিবর্তন ঘটে সেইহেতু ওই বিবর্তনের সঙ্গে তার জীবনচর্যারও বিবর্তন ঘটে। তার মানে, হিন্দুসভ্যতা static নয়, dynamic। হিন্দুসমাজের এই সচলতাই হিন্দুসমাজকে তার সংহতি দান করেছে।

পাঠক লক্ষ্য রাখবেন যে, আমি 'হিন্দুজাতি' বলছি না, 'হিন্দুসমাজ' বলছি। তার কারণ, নৃতত্ত্ববিদগণ 'জাতি' বলতে এক বিশেষ নরগোষ্ঠীকে (racial group) বুঝায়। এরূপ নরগোষ্ঠীর কতকগুলি বিশেষ আবয়বিক ও অন্যান্য সাদৃশ্য থাকে। যেমন 'আর্যজাতি' শব্দটা কোন বিশেষ নরগোষ্ঠীবাচক শব্দ নয়। এটা একটা ভাষাবাচক শব্দ মাত্র। যারা আর্যভাষায় কথা বলত, তাদেরই আমরা 'আর্যজাতি' বলি। এই বইটির তৃতীয় প্রবন্ধ পড়লেই পাঠক বুঝতে পারবেন যে আর্য ভাষাভাষী জাতিগণের মধ্যে কোনরূপ নৃতাত্ত্বিক ও আবয়বিক সাদৃশ্য ছিল না। আবয়বিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে তারা মোটামুটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। এই উভয় শ্রেণীই অন্য দেশ থেকে ভারতে এসেছিল। তারা যখন এখানে এসেছিল তখন ভারত জনমানবহীন দেশ ছিল না। এখানে অন্য জাতিরও (নরগোষ্ঠীর) বসবাস ছিল, এবং তাদেরও এক বিশেষ সমাজ বা জীবনচর্যা ছিল। তাদের জীবনচর্যার সঙ্গে আর্যজাতির জীবনচর্যার কোন সাদৃশ্য ছিল না। মাত্র জীবনচর্যার বৈষম্য নয়, তাদের আবয়বিক বৈষম্যও ছিল। এটা আর্যদের রচিত ঋগ্বেদ গ্রন্থখানা পাঠ করলেই আমরা বুঝতে পারি।

আবয়বিক ও জীবনচর্যার বৈষম্যযুক্ত দুই নরগোষ্ঠী যখন পরস্পরের সম্মুখীন হয়, তখন তাদের মধ্যে বাধে দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও সংঘর্ষ। আর্যদের রচিত ঋগ্বেদ উলঙ্গভাবে প্রকটিত করে সেই দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও সংঘর্ষের ইতিহাস। ঋগ্বেদের বর্ণনা উদ্ধৃত করে আমি প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছি যে, আর্যরা এক সামাজিক দুর্বলতা নিয়ে এদেশে এসেছিল। সে দুর্বলতাটা হচ্ছে যে তাদের মধ্যে পুরুষের অনুপাতে নারীর সংখ্যা ছিল খুব কম। সেজন্য তাদের এদেশের জাতিসমূহের সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম চালাতে হয়েছিল, তাদের মেয়েছেলেদের ছিনিয়ে নেবার জন্য। বংশবৃদ্ধির জন্য এটা তাদের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এজন্যই পরবর্তীকালের ধর্মশাস্ত্রকারগণ বিশেষ জোর দিয়েছিলেন একটা বচনের ওপর। সে বচনটা হচ্ছে 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা'।

যেহেতু ছিনিয়ে এনে বিয়ে করা হত (marriage by capture), সেইহেতু ভার্যার অপর নাম ছিল 'বধূ'। 'বধূ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে যাকে বহন করে আনা হয়েছে। এটা আরও প্রকাশ পায় স্বামীকে 'আর্যপুত্র' বলে অভিহিত করা থেকে। অনার্য রমণী যখন আর্যসমাজভুক্ত পুরুষের গৃহিণী হলেন, তখন তার স্বাভাবিক প্রভাব পড়ল আর্যসমাজের জীবন-চর্যার ওপর। এর ফলে যে পরিবর্তন বা সংশ্লেষণ ঘটল, সেটা প্রথমে মন্থর গতিতে ঘটেছিল। কিন্তু পরে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক যুগে সেটা ক্ষিপ্রতা লাভ করেছিল।

আগের দিনে একটা ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে হিন্দু সভ্যতা বলতে আগন্তুক আর্য-সভ্যতাকেই বুঝায়। তাদের এই ধারণা অনুযায়ী এদেশে আসবার পূর্বে এদেশে বর্বর ও হীন জাতিসমূহ বাস করত, এবং আগন্তুক আর্যরা এসেই তাদের সুসভ্য করে তুলেছিল। এখন আমাদের এবং অন্যান্য দেশে যে সমস্ত প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার হয়েছে, এবং আবিষ্কৃত নির্দশনসমূহের যে নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে প্রাগার্যজাতিসমূহ আর্যজাতির তুলনায় কোন অংশে হীন বা বর্বর ছিল না, বরং তাদের তুলনায় আর্যরাই বর্বর জাতি ছিল। বস্তুত, বৈষয়িক ব্যাপারে প্রাগার্যসভ্যতা আর্যসভ্যতার চেয়ে অনেক উন্নত ছিল। এটা এই পুস্তকের তৃতীয় প্রবন্ধ পড়লেই বুঝতে পারা যাবে। বৈদিক আর্যরা যাদের দস্যু, দাস, অনার্য, অসুর, পণি প্রভৃতি অবজ্ঞাসূচক শব্দের দ্বারা অভিহিত করত, তারা এক বিশাল নাগরিক সভ্যতার বাহক ছিল, এবং তাদের ওই সভ্যতার নিদর্শন আমরা পশ্চিমে সিন্ধু সৌবীর থেকে শুরু করে পূর্বে বাঙলাদেশের বিভিন্নস্থানে আবিষ্কার করেছি। এদেশে আগমনের সময় থেকেই বৈদিক আর্যরা এদেশের অধিবাসীগণের সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম চালিয়েছিল। কিন্তু পরে আর্যরা বাধ্য হয়েছিল তাদেরই মেয়েদের বিয়ে করতে, এবং তার ফলে যে সাংস্কৃতিক সংশ্লেষণ ঘটেছিল, তা-ই পরবর্তীকালে হিন্দুসভ্যতা নামে পরিচিত হয়েছিল। সুতরাং হিন্দু-সভ্যতার যে একটা নৃতাত্ত্বিক ভিত্তি (ethnicity) আছে, সেটাই এই বইয়ে দেখানো হয়েছে। আর্য ও অনার্য সভ্যতার সংশ্লেষণের পর আমরা ভারতীয় সভ্যতার সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ দেখি, যেটা বৈদিক সভ্যতা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

শুধু ধর্ম ও উপাসনা-পদ্ধতির দিক থেকেই যে এই পরিবর্তন ঘটেছিল, তা নয়। সমাজগঠনের দিক থেকেও এক বিরাট পরিবর্তন ঘটেছিল। সমাজের ন্যূনতম সংস্থা হচ্ছে পরিবার। পরিবারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় বিবাহ দ্বারা। বৈদিকযুগে মাত্র এক রকমের বিবাহপদ্ধতি ছিল। কিন্তু বিভিন্ন অনার্যজাতিসমূহের সঙ্গে মিশ্রিত হবার পর, আমরা যে নতুন সমাজের পরিচয় পাই তাতে বর্ণভেদ ও বিভিন্ন বিবাহপদ্ধতির প্রচলন লক্ষ্য করি। ন্যূনপক্ষে আট রকম বিবাহপদ্ধতির কথা শুনি। এ সকল বিবাহপদ্ধতির নাম থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে তখন হিন্দুসমাজের মধ্যে অনার্য সমাজের বিবাহপদ্ধতিসমূহের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। আজ উত্তর ভারতের হিন্দুসমাজের মধ্যে সেসকল বিবাহপদ্ধতির প্রচলন না থাকলেও দক্ষিণ ভারতের হিন্দুসমাজে প্রচলিত আছে। আমি আরও দেখিয়েছি যে রামায়ণে যাদের বানর ও রাক্ষস আখ্যা দেওয়া হয়েছে, তারা ভারতের প্রাগার্য জাতিসমূহ ব্যতীত আর কেউই নয়। বালী, সুগ্রীব প্রভৃতিকে বানর বলাও বাল্মীকির কল্পনাপ্রসূত, কেননা তাদের পিতা সুষেণই ছিল সে যুগের একজন সুদক্ষ শল্যচিকিৎসক। অবশ্য রামায়ণে অনার্যদের যতটা হেয়ভাবে চিত্রিত করা হয়েছে মহাভারতে ততটা করা হয়নি। আমি এই বইয়ে বলেছি যে এই দুই মহাকাব্যের রচনাকাল পরবর্তীকালের হলেও, এদের কাহিনীকাল অতি প্রাচীন। এক কথায়, এই দুই মহাকাব্যের মধ্যে এমন সব উপাদান আছে, যা অনার্যসমাজের ও বৈদিক আর্যদের ভারতে আসবার পূর্ববর্তীকালের।

এই দুই মহাকাব্যের যুগেই আর্য-অনার্য সংস্কৃতির সংশ্লেষণের বীজ উপ্ত হয়েছিল। এই সংশ্লেষণের পরিণতি ঘটেছিল পৌরাণিক যুগে—যে যুগে বৈদিক দেবতাসমূহ পশ্চাদ্‌ভূমিতে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল এবং এক নতুন দেবতামণ্ডলীর পত্তন ঘটেছিল, যে দেবতামণ্ডলীতে অনার্যসমাজের মাতৃদেবীর প্রধান্য স্বীকৃত হয়েছিল। এই পৌরাণিক মাতৃদেবীর কল্পনায় আমরা হিন্দুসভ্যতার এক নতুন রূপ দেখি। সে রূপ আর্য ও অনার্য চিন্তাধারা এই উভয়ের দ্বারাই প্রভাবান্বিত। কিন্তু অভ্যন্তরীণ বৌদ্ধধর্মেরও পরে বহিরাগত ইসলাম ধর্মের সংঘাতে হিন্দুসভ্যতা ক্রমাগতই অনার্য চিন্তাধারার দিকে ঝুঁকে পড়ে। এটার পরিচয় আমরা পাই বৌদ্ধ বজ্রযান সাহিত্য ও মধ্যযুগের বাংলা মঙ্গলকাব্যসমূহে। এই মধ্যযুগেই রচিত হয়েছিল হিন্দু তন্ত্রগ্রন্থসমূহ। তন্ত্রধর্মটাকে আমরা যতটা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখি, এটা তা নয়। এটার একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে।

ভারতের জনসংখ্যার দিকে তাকালে দেখতে পাওয়া যাবে যে উচ্চকোটির লোকদের (ব্রাহ্মণদের) সংখ্যা সমগ্র জনসমুদ্রের মধ্যে অতি নগণ্য। এক কথায় ভারত নিম্নকোটির লোকদেরই দেশ। এই নিম্নকোটির লোকরাই হচ্ছে প্রাগ্‌বৈদিক জনগণের বংশধর। যদিও বৈদিক আর্যগণের সঙ্গে বেশ কিছুকাল তাদের দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও সংঘর্ষ চলেছিল, পরিণতিতে কিন্তু অনার্য সংস্কৃতিরই জয় ঘটেছিল। পরবর্তীকালের হিন্দুসভ্যতার বিবর্তন ও বিকাশে এদের অবদানই সবচেয়ে বেশি। জাতিভেদ, গোত্রবিভাগ, বিবাহে লৌকিক আচার অনুসরণ, যজ্ঞের পরিবর্তে পূজার প্রবর্তন, দেবতার জন্য মন্দির নির্মাণ ও নানারূপ শিল্পিক রীতিনীতি, এ সবই অনার্য সমাজের দান। আজ এই বিংশ শতাব্দীর যান্ত্রিক সভ্যতার যুগেও আমরা প্রাগার্যসমাজের অবদান-সমূহের ক্রমিকতা লক্ষ্য করি। বিবাহে লৌকিক আচারের অনুসরণ, আপদ-বিপদে আভিচারিক ক্রিয়াকলাপাদির আশ্রয় গ্রহণ, পরিবহনের জন্য গোশকটের ব্যবহার, জ্বালানীর জন্য গোময়পিষ্টিকা প্রস্তত ইত্যাদি সেই ক্রমিকতারই সজীব দৃষ্টান্ত। হিন্দুসভ্যতার নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করলে হাজার হাজার এ রকম নিদর্শন পাওয়া যাবে। লোকে এখন আর বৈদিক প্রথা অনুযায়ী সূর্যের উপাসনা করে না। বিহারের লোকেরা সেই প্রাগার্যযুগের 'ছট' পূজাই করে। বাঙলার মেয়েরা ইতু পূজাই করে। বসন্ত রোগাক্রান্ত হলে, শীতলার ওপরই নির্ভর করে। ওলাওঠা হলেও ওলাইচণ্ডীর 'স্থানে' পূজা দান করে। অনুর্বর সধবারা গাছে ঢিল বেঁধে সন্তান কামনা করে। এ সবের সঙ্গে বৈদিক আর্যধর্মের কোন সম্পর্ক নেই।

১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে আমি ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সর্বময় কর্তা স্যার জন মারশাল কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছিলাম 'হিন্দুসভ্যতার গঠনে প্রাগার্যদের দান' সম্বন্ধে অনুশীলন করবার জন্য। ১৯২৯-১৯৩১ খ্রিস্টাব্দকালে আমি এই অনুশীলন চালিয়ে প্রমাণ করি যে হিন্দুসভ্যতার গঠনের মূলে বারো আনা ভাগ হচ্ছে প্রাগার্য উপাদান, আর মাত্র চার আনা ভাগ আর্যসভ্যতার আবরণে মণ্ডিত। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান ডঃ দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকার ইণ্ডিয়ান কালচারেল কনফারেন্সে প্রদত্ত তাঁর সভাপতির ভাষণে বলেন—'হিন্দুসভ্যতা যে আর্য ও অনার্য সভ্যতার মিশ্রণে উদ্ভূত এটা যে চারজন বিশিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক প্রামাণ করেছেন তাঁরা হচ্ছেন স্যার জন মারশাল, রায়বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ, ডঃ স্টেলা ক্রামরিশ ও শ্রীঅতুলকৃষ্ণ সুর।' ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় যখন তাঁর 'বাঙালীর ইতিহাস' প্রকাশ করেন, তখন তিনিও এই মতবাদই ব্যক্ত করেন।

আমার অনুশীলনের প্রতিবেদনে আমি বলেছিলাম যে, মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস ; মৃতব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা ; বিবিধ ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া ও মন্ত্রাদি ; প্রকৃতির সৃজনশক্তিকে মাতৃরূপে

পূজা; শিব ও লিঙ্গ পূজা; কুমারী পূজা; অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষ পূজা; সর্প পূজা; টটেমের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা; দেবদেবীর বাহনের কল্পনা; জন্তু পূজা; গ্রাম; নদী; বৃক্ষ অরণ্য; পর্বত ও ভূমির মধ্যে নিহিত শক্তির পূজা মানুষের ব্যাধি ও দুর্ঘটনাসমূহ দুষ্টশক্তি বা ভূতপ্রেত দ্বারা সংঘটিত হয় বলে বিশ্বাস; বিবিধ নিষেধাজ্ঞাজ্ঞাপক অনুশাসন; জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতিতে লোকাচার; নবপত্রিকার পূজা; শবরোৎসব; নবান্ন; পৌষপার্বণ; হোলি; ঘেঁটু পূজা; চড়ক গাজন; মনসা, শীতলা, কালী, করালী, ছিন্নমস্তা, পর্ণশবরী প্রভৃতির পূজা; দেবতার জন্য মন্দির নির্মাণ; চিত্রাঙ্কন ও লিখন-প্রণালী; দশাবতারবাদ প্রভৃতি আমাদের প্রাগার্যদের কাছ থেকেই নেওয়া।

বিশেষ ধারায় প্রবাহিত হিন্দুজাতির সংস্কৃতিই 'হিন্দুসভ্যতা'। কিন্তু নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, হিন্দু জাতি বলতে কোন বিশেষ নরগোষ্ঠীকে (racial group) বুঝায় না। হিন্দুজাতির মধ্যে নানা নরগোষ্ঠীর মিলন ঘটেছে। এ সব নরগোষ্ঠী হচ্ছে—নর্ডিক, আলপীয়, দিনারিক, আদি-অস্ত্রাল, দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয়। যদিও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এদের একের সঙ্গে অপরের রক্তের মিলন ঘটেছে তা হলেও নৃতত্ত্ববিদগণ এদের চিনে বের করতে কোনরূপ কষ্ট পান না।

আমরা প্রায়ই ভারতের ঐক্যের (unity) কথা বলি। এ ঐক্যটা কিসের? নৃতাত্ত্বিক, না সামাজিক, না সাংস্কৃতিক, না ধর্মীয়, না ভাষাগত, না রাষ্ট্রীয়? প্রথম, ভাষার দিক থেকেই বিচার করা যাক। ভারতের লোকেরা মোটামুটি ৭২৩টা মাতৃভাষায় কথা বলে। মোটামুটি এগুলো আর্য, দ্রাবিড় ও মুণ্ডারী ভাষাগোষ্ঠীভুক্ত। এদের সকলেরই মধ্যে phonetics, etymology, morphology, syntax ও semantics-এর পার্থক্য লক্ষিত হয়। উত্তর ভারতে প্রচলিত বর্ণমালাসমূহের সহিত দক্ষিণ ভারতের বর্ণমালাসমূহেরও রূপগত বৈষম্য লক্ষিত হয়। এ থেকে দেখা যায় যে ভারতের কোন ভাষাগত ঐক্য নেই।

অতীতকালে রাষ্ট্রীয় ঐক্য সাধনের চেষ্টা বিফল হয়েছে। মৌর্যসম্রাট অশোক, গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্ত, পালসম্রাট ধর্মপাল, মোগলসম্রাট আকবর প্রভৃতির আমলে কিছু পরিমাণ রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপিত হয়েছিল, কিন্তু তা সাময়িক মাত্র। একমাত্র ইংরেজ আমলে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপিত হয়েছিল, যার ফলশ্রুতি হিসাবে ভারতবাসীর মনে nationhood সম্বন্ধে একটা সচেতনতা জাগ্রত হয়েছিল। কিন্তু সে nationhood-এর 'ধ্যান' স্বাধীন ভারত রক্ষা করতে সক্ষম হচ্ছে না। বিভিন্ন প্রদেশে অসন্তোষ, বিদ্বেষ ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ তার ইঙ্গিত দেয়।

যদি এই ঐক্য ভাষাগত ও রাষ্ট্রীয় না হয়, তবে কি এটা নৃতাত্ত্বিক, বা সামাজিক, বা সাংস্কৃতিক, বা ধর্মীয়? এ ঐক্য যে নৃতাত্ত্বিক নয়, তা আগেই বলেছি। এখন দেখা যাক এটা সামাজিক কি না? আগেই বলেছি মূলগতভাবে সমাজের ন্যূনতম সংস্থা হচ্ছে পরিবার ও পরিবারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় বিবাহ দ্বারা। আমি আমার 'ভারতের বিবাহের ইতিহাস' গ্রন্থে দেখিয়েছি যে ভারতে যত জাতি আছে, তার চেয়ে বেশি বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে। সর্বত্রই এবং সকল জাতির মধ্যেই 'বিবাহ' এক সুনির্দিষ্ট বিধিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, কিন্তু একের বিধির সঙ্গে অপরের মিল নেই। উত্তর ভারতে মামাতো-পিসতুতো ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহ হয় না। এটা বিধিবিগর্হিত ব্যাপার। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের অনেক জায়গায় এটাই বাঞ্ছনীয় বিবাহ। সেখানে মামা-ভাগ্নীর মধ্যে বিবাহও বিধিসম্মত বিবাহ। উত্তর ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলে বধূর সিঁথিতে সিঁদুর দানই বিবাহের মূল অনুষ্ঠান এবং এটাই সধবা রমণীর চিহ্ন। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে সিঁদুর দান প্রথা নেই। সেখানে সধবা মেয়েরাও সিঁথিতে সিঁদুর পরে

না। সেখানে কণ্ঠে 'তালিবন্ধন'ই বিবাহের প্রধান অনুষ্ঠান, এবং এটাই সধবা স্ত্রীলোকের চিহ্ন। আবার আদিবাসীদের মধ্যেও নানারকম বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে। এ ক্ষেত্রেও উত্তর ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের কোন সাদৃশ্য নেই। আবার উত্তর-পূর্ব সীমান্তের আদিবাসীদের মধ্যে বিধবা শ্বাশুড়ী ও বিধবা বিমাতাকে বিবাহ করার প্রথা প্রচলিত আছে। কেরলের নায়ারদের মধ্যে প্রচলিত বিবাহ অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। বহুপতিক বিবাহ দক্ষিণ ভারতে টোডাদের মধ্যে ও হিমালয়ের পাদদেশস্থ অঞ্চলসমূহে দৃষ্ট হয়। অন্যত্র কিন্তু তা নেই। আছে কোন কোন জায়গায় 'দেবরণ' প্রথা। এ ছাড়া বিবাহে মাঙ্গলিক আচার (যাকে আমরা স্ত্রী আচার বলি) তা ভারতের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন রকমের। এমন কি, একই রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলেও বিভিন্ন জাতির মধ্যে, এর বৈসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অশনবসন-এর বিচিত্রতাও আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে জনগণের জীবনযাত্রা প্রণালীর অনৈক্য। বাঙলা, অসম, ওড়িশা ও পূর্ব উপকূলের জাতিসমূহের প্রধান খাদ্য চাউল। উত্তর ভারত, পঞ্জাব, হরিয়ানা ও অন্যত্র প্রধান খাদ্য গম। পশ্চিম উপকূলস্থ অনেক জাতির প্রধান খাদ্য বজরা ও রাগি। বাঙলা, অসম, ওড়িশা ও আরও দু-এক প্রদেশের লোকেরা মাছ খায়। অন্যত্র মাছ খায় না, কিন্তু মাংস খায়। প্রাচ্য ভারতের লোকেরা সরিষার তেল দিয়ে রন্ধনক্রিয়া সম্পন্ন করে। উত্তরপ্রদেশের লোকেরা কিন্তু ঘি ব্যবহার করে। পশ্চিম ভারতের লোকেরা তিলের তেল ও দক্ষিণ ভারতের লোকেরা নারিকেল তেল ব্যবহার করে। শুধু খাদ্যের দিক দিয়ে নয়, বসন-ভূষণের দিক দিয়েও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এ বিচিত্রতা দৃষ্ট হয়। পশ্চিমবাঙলার মেয়েরা (বিধবা ছাড়া) পাড়-বিশিষ্ট শাড়ি পরে। বিহার ও উত্তরপ্রদেশের মেয়েরাও তাই। তার মানে তারা সেলাইহীন বস্ত্র ব্যবহার করে। কিন্তু রাজস্থান ও পঞ্জাবের মেয়েরা সেলাইবিশিষ্ট বসন পরে। রাজস্থানের মেয়েরা বর্ণাঢ্য ঘাঘরা পরে, পঞ্জাবের মেয়েরা পাজামা পরে। পশ্চিম ভারতের মেয়েরা কাছা দেয়। অন্য জায়গায় মেয়েরা কাছা দেয় না। পুরুষদের ধুতিও নানা জায়গায় নানা কায়দায় পরা হয়। বাঙলায় চটি জুতা ব্যবহারই প্রচলিত ছিল। কিন্তু উত্তর ভারতের লোকেরা গোড়ালিবিশিষ্ট জুতা পরত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ভারতে সামাজিক ও জীবনযাত্রা প্রণালীরও কোন ঐক্য নেই।

ধর্মীয় ক্ষেত্রেও আমরা নানারূপ বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করি। দুর্গাপূজা, দশেরা, দীপাবলী, দেওয়ালী, হোলি, দোলযাত্রা প্রভৃতি উৎসবগুলোকে আমরা জাতীয় উৎসব বলি। কিন্তু এগুলোর অনুষ্ঠানের রূপ ও সময়কাল দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকমের। যদিও বাঙালি আজ যেখানেই গেছে সেখানেই দুর্গাপূজা করছে, তা হলেও মূলগতভাবে এটা বাঙলা দেশেরই উৎসব। যদিও দুর্গাপূজা ও দশেরা সমকালেই অনুষ্ঠিত হয় দেখা যাবে যে, উভয় উৎসবের মধ্যে একটা মূলগত পার্থক্য আছে। বস্তুত হিন্দুর এ সব উৎসবের রূপ দেশের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রকমের। আবার উৎসব পালনের সময়কালও ভিন্ন। যেমন বাঙলাদেশে হোলি বা দোলযাত্রা ফাল্গুনী পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত হয়। ও-দিনই বাঙলার জনগণ পরস্পর পরস্পরের গায়ে রঙ দেয়। কিন্তু বিহার থেকে আরম্ভ করে সমগ্র উত্তর ভারতে পূর্ণিমা ছেড়ে গেলে, পরদিনই রঙ দেওয়া হয়। উৎসবের মর্যাদার দিকে থেকেও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য হয়। বাঙলার শ্রেষ্ঠ উৎসব হচ্ছে দুর্গোৎসব। কিন্তু সংলগ্ন বিহার প্রদেশে তা নয়। সেখানে কার্তিকী ষষ্ঠীতে অনুষ্ঠিত 'ছট' পরবই বছরের শ্রেষ্ঠ উৎসব। উত্তর ভারতে দশেরার তুলনায় 'হোলি'টাই বোধ হয় শ্রেষ্ঠ উৎসব। পশ্চিম ভারতে দীপাবলীই শ্রেষ্ঠ উৎসব। এ তো গেল, সমষ্টির ব্যাপার। ব্যষ্টির দিক থেকেও ধর্মীয় বিভেদ অসাধারণ। কেহ বৈষ্ণব, কেহ সৌর, কেহ গাণপত্য, কেহ শৈব,

কেহ শাক্ত, কেহ লিংগায়েত, কেহ তান্ত্রিক ইত্যাদি। আবার এসব ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে অসংখ্য সম্প্রদায় আছে। এক কথায়, ভারত সর্ববিষয়েই বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার দেশ। কিন্তু এত বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা থাকা সত্ত্বেও, আমরা ভারতের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনের মধ্যে অন্তঃসলিলার মত প্রবাহিত হতে দেখি একটা সাধারণ ধারা, যে ধারা রূপ দিয়েছে হিন্দুসভ্যতাকে। এই হিন্দুসভ্যতাকে 'হিন্দুধর্ম' বা 'সনাতন ধর্ম' বলা হয়। এই সনাতন ধর্মের 'ধ্যান'ই হিন্দুসভ্যতাকে তার সংহতি দান করেছে। সেজন্যই এত বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি 'হিন্দুসভ্যতা'র একটা ঐক্যরূপ।

Scanned by CamScanner

হিন্দুসভ্যতার উৎস

গ্রেগরী পশেল (Gregory Possehl) হচ্ছেন আমেরিকার পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতত্ত্বের একজন অভিজ্ঞ অধ্যাপক। তিনি বলেন যে চীন, সুমের ও মিশরের প্রচীন সভ্যতাসমূহের তুলনায় সিন্ধুসভ্যতা অনেক উন্নত ছিল। কেননা, সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রসমূহেই জগতের প্রাচীনতম পয়ঃপ্রণালী ও পোতাশ্রয় আবিষ্কৃত হয়েছে। সিন্ধুসভ্যতার নিদর্শন এক বিস্তৃত অঞ্চলে শতাধিক স্থানে পাওয়া গিয়েছে এবং এটা ১৫ লক্ষ বর্গমাইলব্যাপী বিস্তৃত অঞ্চলে প্রাদুর্ভূত হয়েছিল। এই সিন্ধুসভ্যতাই হিন্দুসভ্যতার উৎস।

বর্তমান শতাব্দীর বিশের দশক পর্যন্ত আমাদের ধারণা ছিল যে হিন্দুসভ্যতা আগন্তুক আর্যগণ কর্তৃক উদ্ভূত হয়েছিল। তখন পর্যন্ত আমাদের ধারণা ছিল যে দাস, দস্যু, অসুর, পণি, কিরাত, নিষাদ প্রভৃতি যে সকল দেশজ অনার্য জাতিসমূহের উল্লেখ আমরা বৈদিক সাহিত্যে পাই, তারা সবাই বর্বর ও অসভ্য জাতি ছিল। সেই যুক্তির ভিত্তিতেই পরবর্তীকালে উদ্ভূত হিন্দুসভ্যতা আর্যগণ কর্তৃক সৃষ্ট সভ্যতা বলে গৃহীত হয়েছিল। এই ধারণাই পণ্ডিতমহলে প্রচলিত ছিল। কিন্তু সেই ধারণাকে এক নিমিষেই নস্যাৎ করে দেয় বর্তমান শতাব্দীর বিশের দশকে আবিষ্কৃত যুগান্তকারী সিন্ধুসভ্যতা।

পণ্ডিতমহলে এটা প্রায় সর্ববাদিসম্মতক্রমে স্বীকৃত হয়েছে যে আগন্তুক আর্যরা খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ থেকে ১৫০০ বছরের মধ্যে কোন সময় ভারতে প্রবেশ করেছিল। কিন্তু সিন্ধুসভ্যতার প্রাদুর্ভাবকাল নির্ণীত হয়েছে খ্রিস্টপূর্ব ২৭০০ বছর থেকে ১৯০০ বছর পর্যন্ত। সিন্ধুসভ্যতার এই প্রাদুর্ভাবকাল রেডিয়োকারবন—১৪ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দ্বারা স্থিরীকৃত হয়েছে। এ থেকে দুটি সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হতে পারি। প্রথম, সিন্ধুসভ্যতা আগন্তুক আর্যসভ্যতা অপেক্ষা প্রাচীন, এবং দ্বিতীয়ত, সে সভ্যতার বাহকরা বর্বর অসভ্য জাতি ছিল না। বৈষয়িক ও অন্যান্য অনেক বিষয়েই সিন্ধুসভ্যতার বাহকরা আর্যগণ অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ ছিল।

আর্যরা ছিল যোদ্ধার জাত, আর সিন্ধুসভ্যতার বাহকরা ছিল বণিকের জাত। এই বণিকদের ঐশ্বর্য ও ধনদৌলত আর্যদের মনে ঈর্ষার সঞ্চার করেছিল। সেজন্যই আর্য গ্রামবাসীরা সিন্ধুসভ্যতার নগরসমূহকে ধ্বংস করতে প্রবৃত্ত হয়েছিল। নগরসমূহকে ধ্বংস করে বিজয়গৌরবের উন্মত্ততায় তারা তাদের প্রধান দেবতা ইন্দ্রের নাম রেখেছিল 'পুরন্দর'।

আমি অন্যত্র অনেকবারই বলেছি যে আর্যরা যখন এদেশে এসেছিল, তখন তাদের সঙ্গে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ছিল খুব কম। ইন্দ্রের কাছে আর্যদের পুনঃপুন স্ত্রীধন পাবার প্রার্থনা থেকে বুঝতে পারা যায় যে আর্যরা যে বিপর্যয়ের প্রতিঘাতে এদেশে আসতে বাধ্য হয়েছিল, তাতে তাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি যথাযথ সংখ্যক স্ত্রীলোক সঙ্গে নিয়ে আসা। সেজন্যই এদেশের নারীদের ওপর তাদের অত্যন্ত লোভ ছিল, এবং তাদের পাবার জন্যই তারা ইন্দ্রের কাছে পুনঃপুন প্রার্থনা করত। এখানে একটা কথা বলা প্রাসঙ্গিক হবে। 'পত্নী' অর্থে 'বধূ' শব্দের প্রয়োগ। সামগায়নের উনাদিসূত্র (১।৮৫) অনুযায়ী 'বধূ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে যাকে বহন করে আনা হয়েছে (বহ+উ—র্ম্ব, 'হ' শব্দ থেকে 'ধ' শব্দ উৎপন্ন হয়েছে)। তার মানে যাকে কেড়ে আনা হয়েছে। নৃতত্ত্বের ভাষায় যাকে 'ম্যারেজ বাই ক্যাপচার' বলা হয়

(এটাই হচ্ছে 'বধূ' শব্দের সবচেয়ে প্রাচীনতম ব্যুৎপত্তি ; পরবর্তীকালে লৌকিক প্রথা অনুযায়ী এটা 'বন্ধ' ধাতু থেকে উৎপন্ন করা হয়েছিল)। এ সম্পর্কে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে প্রাচীনকালে স্বামীকে 'আর্যপুত্র' বলা হত। এরূপ সম্বোধন সে যুগেরই প্রতিধ্বনি করে যে-যুগে স্বামী আর্য হতেন, আর স্ত্রী অনার্য হত, এবং স্ত্রী গৌরবার্থে স্বামীকে 'আর্যপুত্র' বলে সম্বোধন করত। মহাভারতে বিবৃত ভিক্ষায় বেরিয়ে ব্রাহ্মণ কর্তৃক শূদ্র রমণী গ্রহণও বৈদিক যুগের আর্য-অনার্য যৌন সম্পর্কের ইঙ্গিত করে। অনার্য রমণী যখন আর্য গৃহিণী হল, তখন অনার্য ভাষা, সভ্যতা ও লোকযাত্রা আর্য জীবনচর্যাকে প্রভাবান্বিত করল, এমন কি আর্য দেবতামণ্ডলীরও পরিবর্তন ঘটল।

বৈদিক দেবতাগণের স্ত্রী ছিল বটে, কিন্তু দেবতামণ্ডলীর মধ্যে তাদের কোন আধিপত্য ছিল না। কিন্তু পৌরাণিক যুগে তারাই হলেন পুরুষ দেবতার শক্তির উৎস। শিবজায়া দুর্গা এগিয়ে এলেন 'দেবী' হিসাবে দেবতামণ্ডলীতে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করতে। তাঁর আঁচল ধরে এলেন অনার্য সমাজের সেই সমস্ত দেবী, যাঁরা আগে লুকিয়েছিলেন গাছতলায়, ঝোপজঙ্গলে ও পর্বতকন্দরে। সেই সব দেবী সমপর্যায় লাভ করলেন 'দেবী'র সঙ্গে। বৈদিক যুগের আর্যরা যাঁদের ঘৃণার চোখে দেখতেন ও যাঁদের সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম করতেন, শেষ পর্যন্ত সেই অনার্য নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীসমূহেরেই জয় হল। দুই সভ্যতার এক সংশ্লেষণ ঘটল।

হিন্দুসভ্যতা যে আর্য ও অনার্য সভ্যতার মিশ্রণে উদ্ভূত, এটা ১৯২৯-১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে যে প্রতিবেদন পেশ করি, তার অংশবিশেষ নীচে প্রদান করছি।

১. মাতৃদেবীর পূজা : সুমের এবং ভারতের মাতৃদেবীর মধ্যে কতকগুলি মূলগত সাদৃশ্য দেখে কোন সন্দেহই থাকে না যে এই উভয় দেশের মাতৃপূজা একই সাধারণ উৎস থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। এই সাদৃশ্যগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : (ক) উভয়দেশেই মাতৃদেবী 'কুমারী' হিসাবে কল্পিত হয়েছিলেন, অথচ তাঁদের ভর্তা ছিল ; (খ) উভয় দেশেই মাতৃদেবীর বাহন সিংহ ও তাঁর ভর্তার বাহন বলীবর্দ ; (গ) উভয় দেশেই মাতৃদেবীর নারীসুলভ গুণ থাকা সত্ত্বেও তিনি পুরুষোচিত কর্ম (যেমন যুদ্ধ) করতে পারতেন ; (ঘ) মেসোপটেমিয়ার লিপিসমূহে তাঁকে বারবার 'যুদ্ধবাহিনীর নেত্রী' বলা হয়েছে, মার্কণ্ডেয়পুরাণের 'দেবীমাহাত্ম্য' বিভাগেও বলা হয়েছে যে, দেবতারা যখন অসুরগণ কর্তৃক পরাহত হয়েছিলেন তখন তাঁরা মহিষাসুরকে বধ করবার জন্য দুর্গার শরণাপন্ন হয়েছিলেন ; (ঙ) মেসোপটেমিয়ার মাতৃদেবী পর্বতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, সেজন্য তাঁকে 'পর্বতের দেবী' বলা হত। ভারতেও মাতৃদেবীর পার্বতী, হৈমবতী, বিন্ধ্যবাসিনী প্রভৃতি নাম তাই সূচিত করে ; (চ) সুমেরে দেবীর নাম ছিল 'নানা', সে নাম হিংলাজে নানাদেবীর নামে এখনও বর্তমান ; (ছ) যাঁরা বলেন যে সুমেরীয়দের পরিধেয় বসন 'কৌণক' তালপাতা দিয়ে তৈরি করা হত, তাঁরা প্রাচীন ভারতে দেশজ লোকদের পাতা ও বল্কল পরিধান ও পর্ণশবরীর কথা স্মরণে রাখবেন ; (জ) দুদেশেই ধর্মীয় গণিকাবৃত্তি (বা সাময়িকভাবে সতীত্বের বিসর্জন দেওয়া) প্রথা প্রচলিত ছিল। এটার উদ্ভব হয়েছিল সদৃশবিধানী (mimetic বা homoeopathic) ঐন্দ্রজালিক পদ্ধতি থেকে। সধবা বা অনূঢ়া উভয়শ্রেণীর মেয়েরাই দেবীর প্রসন্নতা লাভ করবার জন্য সাময়িকভাবে তাদের সতীত্বের বিসর্জন দিত। বলা বাহুল্য, ভারতে এটা বামাচারী তন্ত্রধর্মের বৈশিষ্ট্য ; (ঝ) উভয় দেশেই দেবীপূজার সঙ্গে নরবলি প্রচলিত ছিল। এখানে উল্লেখনীয় যে সুমেরীয় সভ্যতা দেশজ সভ্যতা ছিল না। কিংবদন্তী অনুযায়ী সুমেরীয়রা পূর্বদিকের কোন পার্বত্য দেশ থেকে সুমেরে গিয়েছিল।

মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা প্রভৃতি নগরে দেবীপূজার যে ব্যাপক প্রচলন ছিল, তা মৃন্ময়ী

মাতৃকাদেবীর মূর্তিসমূহ থেকে প্রকাশ পায়। পুরুষ দেবগণ কর্তৃক অধিকৃত ঋগ্বেদের দেবতামণ্ডলীতে মাতৃদেবীর কোন স্থান ছিল না। পরবর্তীকালে যখন সাংস্কৃতিক সমন্বয় ঘটেছিল, তখনই প্রাগার্য দেবীসমূহের হিন্দুধর্মে অনুপ্রবেশ ঘটে। যেমন, বৈদিক যুগের অন্তিমে আমরা কালী, করালী প্রভৃতী দেবীর নাম পাই। কিন্তু তখনও তাঁরা তাঁদের মৌলিক স্বরূপ বা স্বতন্ত্রতা বজায় রেখে অনুপ্রবেশ করতে পারেননি। তাঁরা বৈদিক অগ্নি উপাসনারই অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হয়েছিলেন। কিন্তু আর্যরা যতই পূর্বদিকে অগ্রসর হতে লাগলেন, তাঁদের ধর্মীয় গোঁড়ামি তত হ্রাস পেতে লাগল। তখন এই সব অনার্য দেবতা রীতিমত হানা দিয়ে আর্যধর্মমণ্ডলীতে তাঁদের আসন করে নিলেন। পুরাণাদি গ্রন্থে আমরা বিন্ধ্যবাসিনী, পর্ণশবরী প্রভৃতি দেবীকে অনার্যদেবীর স্বরূপেই পাই। তারপর প্রাগার্য তন্ত্রধর্মও ব্রাহ্মণ্যধর্মকে প্রভাবান্বিত করে।

বর্তমান হিন্দুধর্মে গ্রাম-দেবীসমূহ বেশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। এটা সহজেই অনুমেয় যে প্রাগার্য যুগেও তাঁদের অনুরূপ আধিপত্য ছিল। বর্তমান ভারতের প্রত্যেক গ্রাম বা শহরে আমরা কোন না কোন দেবীর 'থান' বা প্রতীক দেখতে পাই। এসব প্রাগার্য দেবীসমূহ এখন ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাব দ্বারা মণ্ডিত হয়েছেন।

মাতৃপূজার উদ্ভব যে ভারতের প্রাগার্য জাতিসমূহের মধ্যে হয়েছিল, তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। কোন কোন গ্রাহ্যসূত্রে আমরা সাধারণ লোকগণ কর্তৃক পূজিত দুটো একটা লোকায়ত দেবীর উল্লেখ পাই। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখনীয় 'বাসিনী', যাঁকে আমরা বিন্ধ্যবাসিনী নামের মধ্যে পাই। এঁরা পূজিত হতেন সন্তান-সন্ততি ও আয়ুলাভের জন্য। এঁরা যে সকলেই প্রাগার্য দেবীসমূহের উত্তরস্বরূপা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

প্রাচীন ভারতের আর এক লোকায়ত দেবী ছিলেন 'শ্রী'। 'শতপথ ব্রাহ্মণ'-এ আমরা তার প্রথম উল্লেখ পাই। সেখানে তাঁকে প্রণয় ও উর্বরতার দেবী বলা হয়েছে, এবং খুব অর্থবহভাবে তাঁর উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য শয্যার মাথার দিকে রাখা হত। বৈদিক যুগের একেবারে অন্তিমদশার পূর্ব পর্যন্ত কোথাও বিষ্ণুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের উল্লেখ নেই। 'সিরি কালকন্নিজাতক' অনুযায়ী 'সিরি দেবী' হচ্ছেন চারজন লোকপালের অন্যতম 'ধৃতরাষ্ট্র'-এর কন্যা। সেখানে 'সিরি দেবী'কে আমরা বলতে দেখি : 'মানবজাতির ওপর আধিপত্য দেবার অধিষ্ঠাত্রী দেবী আমি ; আমি জ্ঞান, সম্পদ ও সৌন্দর্যের দেবী।' মহাভারত অনুযায়ী শ্রীদেবী প্রথমে দানবদের সঙ্গে বাস করতেন ; পরে দেবগণের ও ইন্দ্রের সঙ্গে। মনে হয়, এরই মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে তিনি গোড়ায় প্রাগার্যগণ কর্তৃক পূজিত হতেন, এবং পরে ব্রাহ্মণ্যদেবতামণ্ডলীতে স্থান পেয়েছিলেন।

পৌরাণিক দেবতামণ্ডলী গঠিত হবার সময় এই সকল লোকায়ত দেবীগণ একে একে ব্রাহ্মণ্যধর্মের মধ্যে স্থান পেয়ে শিবজায়া মহাদেবী শক্তিরই বিভিন্ন প্রকাশ হিসাবে পরিগণিত হলেন।

২. আদি-শিব : সিন্ধু উপত্যকার প্রাগার্য অধিবাসীগণ যে মাত্র মাতৃদেবীর পূজা করতেন তা নয়। প্রাচীন এশিয়ার প্রাচীন অধিবাসীদের ও বর্তমানকালের ভারতীয় হিন্দুদের মত তাঁরা সৃজন-শক্তির আধার হিসাবে এক পুরুষ দেবতারও উপাসনা করতেন। মহেঞ্জোদারো থেকে যে তিন-মুখ বিশিষ্ট এক দেবতারও মূর্তি পাওয়া গিয়েছে, তার দ্বারা এটা প্রমাণিত হচ্ছে। তিনি সিংহাসনের ওপর আসীন, তাঁর বক্ষ, কণ্ঠ ও মস্তক উন্নত। তাঁর এক পা অপর পায়ের ওপর আড়াআড়িভাবে স্থাপিত, তাঁর হাত দুটি বিস্তৃত অবস্থায় হাঁটুর ওপর অবস্থিত। তিনি পর্যঙ্ক আসনে উপবিষ্ট হয়ে ধ্যানস্থ ও ঊর্ধ্বলিঙ্গ। তাঁর উভয়পার্শ্বে চার প্রধান দিক-নির্দেশক

হিসাবে হাতি, বাঘ, গণ্ডার ও মহিষের প্রতিমূর্তি অঙ্কিত। তাঁর সিংহাসনের নীচে দুটি মৃগকে পশ্চাদ্দিকে মুখ করে দাড়িয়ে থাকতে দেখা যায়।

বৈদিক রুদ্রদেবতা যে এই আদি-শিবের প্রতিরূপেই কল্পিত হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বৈদিক রুদ্র যে আর্যদের একজন অর্বাচীন দেবতা ছিলেন তা বুঝতে পারা যায় এই থেকে যে সমগ্র ঋগ্বেদে তাঁর উদ্দেশে মাত্র তিনটি স্তোত্র রচিত হয়েছিল, এবং অগ্নিদেবতার সঙ্গে তাঁর সমীকরণ করা হয়েছিল। অগ্নিদেবতার সঙ্গে সমীকরণের ফলে শেষের দিকের বৈদিক সাহিত্যে আমরা হর, মৃদ, শর্ব, ভব, মহাদেব, উগ্র, পশুপতি, শঙ্কর, ঈশান প্রভৃতি দেবতাকে শিবের সঙ্গে অভিন্ন দেখি। শতপথব্রাহ্মণে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে 'শর্ব' ও 'ভব' এই দেবতাদ্বয় প্রাচ্যদেশীয় অসুরগণ ও বাহীকগণ কর্তৃক পূজিত হন।

৩. লিঙ্গ-যোনি পূজা : হিন্দুধর্মে শিব ও শক্তি যে মাত্র নরাকারে পূজিত হন, তা নয়; লিঙ্গ ও যোনি—এই প্রতীক চিহ্ন হিসাবেও পূজিত হন। এরূপ প্রতীক যে মাত্র সিন্ধু উপত্যকায় তাম্রাশ্মীয়যুগের আবিষ্কারসমূহের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে তা নয়। ঋগ্বেদেও তাদের 'শিশ্নোপাসক' বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

৪. সূর্যপূজা : ভূমিকর্ষণের ওপর সৌর শক্তির প্রভাব মানুষ বরাবরই লক্ষ্য করেছে। এ কারণেই কৃষির প্রাচিন কেন্দ্রসমূহে আমরা মাতৃকাদেবীর পূজার সঙ্গে সূর্যপূজার সংযোগ লক্ষ্য করি। সূর্যের প্রতীক চিহ্ন—চক্র ও স্বস্তিক—আমরা মহেঞ্জোদারোয় প্রাপ্ত কয়েকটি সীলমোহরের ওপর দেখতে পাই। প্রাগার্য সূর্যপূজা এখনও হিন্দুর লোকায়ত ধর্মের মধ্যে জীবিত আছে। বিহারের ছটপূজা ও বাঙলার ইতুপূজা ও রালদুর্গার ব্রত তার প্রমাণ। বৈদিক আর্যগণের মধ্যে সূর্যপূজার প্রচলন থাকলেও, এ সকল লোকায়ত পূজা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

৫. হিন্দু-দশাবতার : সম্ভবত, হিন্দুর অবতারসমূহ, এ দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতির নায়ক বা 'হিরো' ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্তত তিনজনকে যথা রাম, কৃষ্ণ ও বুদ্ধকে আমরা সেভাবেই জানি। অন্যান্য অবতারসমূহ যথা মীন, কুর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, ওইরূপ সাংস্কৃতিক নায়কদের টটেম-এর নাম থেকে যে উদ্ভূত এটা অসম্ভব নয়। কেননা, সুমেরীয় ট্রাডিশন অনুযায়ী সুমেরীয় সংস্কৃতির নায়ক 'নরমীন' রূপ ধারণ করে পারস্য উপসাগর সন্তরণ দ্বারা অতিক্রম করে সুমেরের এরিডু নগরে উপস্থিত হয়েছিল। ভারত থেকেও তিনি যেতে পারেন, এবং তিনি হিন্দুর মৎস্যাবতারেরই এক বিকল্প সংস্করণ কিনা, তা বিবেচ্য। এখানে কুঠারধারী মিশরীয় দেবতা 'রামন'-এর সঙ্গে পরশুরামেরও তুলনা করা যেতে পারে।

৬. নাগপূজা : প্রাগার্য ভারতের ধর্মীয় ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে একটা উজ্জ্বল রঙের প্রলেপ-বিশিষ্ট মৃৎ অলঙ্করণ ফলক যার উপর চিত্রিত করা হয়েছে দুপাশে দুজন সর্পের ফণাধারী ভক্তবিশিষ্ট এক আড়াআড়িভাবে পা রেখে বসা দেবতা, ঠিক যেভাবে পরবর্তীকালে ভাস্কর্যে আমরা বুদ্ধকে অনুরূপ ভক্তদ্বারা পূজিত হতে দেখি। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে সিন্ধুসভ্যতার এই নাগ-কিরীটধারী ভক্তগণ, পরবর্তীকালের ইতিহাসে ও উপকথায় উল্লিখিত নাগজাতির লোক ব্যতীত আর কেউই নয়। বর্তমানে নাগজাতির লোকেরা কাশ্মীরের সীমান্তে চন্দ্রভাগা ও ইরাবতী নদীদ্বয়ের মধ্যস্থ ভূখণ্ডে বাস করে, এবং তারা সাপের ফণার চন্দ্রাতপের তলায় অবস্থিত নরাকার এক দেবতার পূজা করে, যিনি বহু নামে পরিচিত, যথা, শেষনাগ, বাসুকি, বাসদেও, বাসকনাগ, তক্ষক, তখত্‌নাগ ইত্যাদি।

সিন্ধুসভ্যতা যে অবৈদিক, তা এই নাগ-পূজা থেকেই প্রমাণিত হয়, কেননা ঋগ্বেদে নাগপূজার কোন উল্লেখ নেই। পরবর্তীকালের হিন্দুধর্মে আমরা নাগপূজার ব্যাপক প্রচলন দেখি। যেহেতু

ঋগ্বেদে এর উল্লেখ নেই এবং ভারতের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে এর ব্যাপক প্রচলন আছে, সেহেতু আমরা নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে হিন্দুরা নাগপূজা বা মনসাপূজা প্রাগার্য যুগ থেকেই পেয়েছে।

৭. অশ্বত্থপূজা : সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রসমূহে প্রাপ্ত সীলমোহরসমূহ থেকে জানতে পারি যে প্রাগার্যরা অশ্বত্থ বৃক্ষের বিশেষ আরাধনা করত। সারা ভারতের প্রাগার্য ও হিন্দুগণ এখনও অশ্বত্থ বৃক্ষকে বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখে। তাদের সকলেরই ধারণা যে মৃতের আত্মাসমূহ অশ্বত্থ বৃক্ষে বাস করে। অথচ বৈদিক ধর্মকর্ম ও উপকথার মধ্যে বৃক্ষপূজার কোন স্থান নেই। অশ্বত্থ বৃক্ষের প্রতি শ্রদ্ধা আমরা অথর্ববেদেই প্রথম লক্ষ্য করি।

৮. শিল্প ও স্থাপত্য : শিল্প ও স্থাপত্য ক্ষেত্রেও প্রাগার্য জাতিসমূহের অবদান কম নয়। ভারতীয় শিল্প ও স্থাপত্য আর্যদের প্রতিভা প্রসূত, এ সম্বন্ধে যে ধারণা প্রচলিত আছে তা ভ্রান্ত।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে পঞ্জাবেই আর্য-প্রভাব সবচেয়ে বেশি প্রতিফলিত হয়েছিল। কিন্তু ভারতীয় শিল্প ও ভাস্কর্যের নিদর্শনসমূহের অবস্থান পর্যালোচনা করলে যে বিচিত্র ব্যাপার আমরা লক্ষ্য করি তা হচ্ছে পঞ্জাব থেকে আমরা যতই দূরে যাই, ততই শিল্প ও ভাস্কর্য নিদর্শনের সংখ্যা বেশি পরিমাণে দেখি। ভারতের শিল্প ও স্থাপত্য যে আর্য চিন্তাধারা বা শিল্পিক প্রযুক্তির দ্বারা প্রভাবান্বিত নয়, এটাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

অলংকরণের মনোহারিত্বের জন্য ভারতীয় শিল্প ও স্থাপত্যের যে খ্যাতি আছে, তা উত্তর ভারতেই সবচেয়ে দুর্বল এবং দক্ষিণ ভারতে সব চেয়ে সবল। এটা আমরা দক্ষিণের অমরাবতীর ভাস্কর্যসমূহের ছন্দময় মাধুর্য থেকেই বুঝতে পারি। বস্তুত তক্ষশিলায় খননকার্যের ফলে আমরা জানতে পেরেছি যে গ্রীকদের আসবার আগে পঞ্জাব (যেখানে আর্যদের বসতি ছিল) অঞ্চলে কোন শিল্প বা ভাস্কর্য ধারা ছিল না।

কিন্তু প্রাগার্য হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো প্রভৃতি নগরে আমরা শিল্প ও স্থাপত্যের অনেক নিদর্শন পাই। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর লোকেরা মূর্তি ও মন্দির দুই-ই তৈরি করত। এ ছাড়া আর একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করি। পরবর্তীকালে হিন্দু মন্দিরের সংলগ্ন একটা করে পুষ্করিণী থাকত। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতেও ঠিক তাই ছিল। মন্দিরের সংলগ্ন পবিত্র পুষ্করিণী খনন যে প্রাগার্য প্রথা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না।

৯. লিপির উৎপত্তি : সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রসমূহে যে লিখন-পদ্ধতির প্রচলন ছিল, তার ভূরি ভূরি প্রমাণ আমরা সীলমোহরসমূহ থেকে পেয়েছি। বর্তমান ভারতে প্রচলিত অধিকাংশ লিখন প্রণালীই ব্রাহ্মীলিপি থেকে উদ্ভূত। ষাট বছর পূর্বেই আমি লিখেছিলাম যে ব্রাহ্মীলিপি সিন্ধুলিপি থেকেই উদ্ভূত। আজ পণ্ডিতমহল কর্তৃক এটা স্বীকৃত হয়েছে।

১০. গণিত বিদ্যা : গণিত বিদ্যার বিভিন্ন শাখা ও দশমিক প্রথা যে ভারত থেকেই অন্যান্য দেশে গিয়েছিল, তা অনেক আগেই পণ্ডিত মহলে স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু এ সব বিদ্যা যে আর্যদের এ দেশে আসবার পূর্বেই ভারতে অনুশীলিত হত, তার প্রমাণ আমরা সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রসমূহ থেকে পেয়েছি। সিন্ধুসভ্যতার ধারকদের পাটিগণিত, দশমিক গণন, জ্যামিতির ও হিসাব রক্ষণের বিশেষ রকম জ্ঞান ছিল। জ্যোতিষ ও চিকিৎসা বিদ্যাতেও তারা পারঙ্গম ছিল।

১১. মূর্তিপূজা : মূর্তিপূজা প্রাগার্যদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এবং আর্যরা প্রাগার্যদের কাছ থেকে মূর্তিপূজা পেয়েছিল। প্রাগার্যদের ধর্মাচরণ পদ্ধতি যখন হিন্দুধর্মে স্বীকৃত হয়, তখন

ধর্মানুষ্ঠানের ক্ষেত্রে, এক নতুন সংস্কার দেখা যায়। সেই নতুন সংস্কারই, পরবর্তীকালে হিন্দুধর্ম নামে পরিচিত হয়।

১২. ভাষা ও সাহিত্য : সিন্ধু উপত্যকায় বসবাসকারী প্রাগার্যরা বৈষয়িক অভ্যুদয়ের দিক থেকে আর্যদের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত ছিল। কিন্তু প্রজ্ঞার দিক থেকে তারা আর্যদের সমকক্ষ ছিল না। আর্যদের ভাষা এত উন্নত ছিল যে, এই ভাষাতেই একমাত্র উচ্চ সূক্ষ্ম চিন্তা সম্ভবপর ছিল। ফলে এ ভাষাতেই পরবর্তীকালের সাহিত্যসমূহ রচিত হয়েছিল। কিন্তু সে সাহিত্য উচ্চকোটির লোকদেরই আকৃষ্ট করেছিল, জনতাকে নয়।

৩

দুই সভ্যতার সংঘর্ষ ও সংশ্লেষণ

আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, 'আর্য' শব্দটি মোটেই জাতিবাচক শব্দ নয়। এটা ভাষাবাচক শব্দ। যে সকল জাতি বা নরগোষ্ঠী এই ভাষায় কথা বলত, তাদেরই আমরা 'আর্য' বলি। নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়েছে যে দুই বিশিষ্ট নরগোষ্ঠী আর্যভাষায় কথা বলত। তাদের মধ্যে এক গোষ্ঠী ছিল নর্ডিক ও অপর গোষ্ঠী আলপীয়। এই দুইগোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যমূলক প্রভেদ ছিল মাথার খুলির আকার। নর্ডিকরা ছিল দীর্ঘ-কপাল জাতি, আর আলপীয়রা হ্রস্ব-কপাল জাতি।

ভাষাতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্বের ভিত্তিতে আধুনিক পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেছেন যে রুশ দেশের উরাল পর্বতের দক্ষিণে অবস্থিত শুষ্ক তৃণাচ্ছাদিত সমতল ভূখণ্ডই আর্যজাতির আদি বাসস্থান ছিল। এখানে 'নার্ডিক' ও 'আলপীয়' এই উভয় গোষ্ঠীর আর্যরাই বাস করত। নবোপলীয় যুগে আলপীয়রা কৃষিপরায়ণ হয়, আর নর্ডিকরা পশুপালনে রত থাকে। এর ফলে উপাস্য দেবতা সম্বন্ধে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ও বিবাদের সৃষ্টি হয়। নর্ডিকরা প্রকৃতির বিভিন্ন প্রকাশের উপাসক ছিল, এবং উপাস্যদের 'দেব' বলে অভিহিত করত। আর আলপীয়রা কৃষির সাফল্যের জন্য সৃজনশক্তিরূপ দেবতাসমূহের পূজা করত, তাদের তারা 'অসুর' নামে অভিহিত করত। মনে হয় আলপীয়রাই প্রথম নিজেদের এক বিশেষ শাখায় বিভক্ত করে। শিরদরিয়া ও আমুদরিয়া নদীদ্বয় বেষ্টিত সুবিস্তীর্ণ সমতল ভূখণ্ডে বসবাস শুরু করে। তারপর তারা পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে ইরান থেকে এশিয়া মাইনর পর্যন্ত নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে। তাদেরই একদল এশিয়া মাইনর বা বেলুচিস্তান থেকে পশ্চিম সাগরের উপকূল ধরে অগ্রসর হয়ে ক্রমশ সিন্ধু, কাথিয়াবাড়, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কুর্গ, কন্নাদ ও তামিলনাডু প্রদেশে পৌঁছায় এবং আর একদল পূর্ব উপকূল ধরে বাঙালা ও ওড়িশায় আসে। আরও মনে হয় তারা দ্রাবিড়দের অনুসরণে এসেছিল। আর অপর পক্ষে নর্ডিকরা তাদের আদি বাসস্থান থেকে দু দলে বিভক্ত হয়ে একদল উত্তরপশ্চিমের প্রবেশদ্বার দিয়ে পঞ্চনদের উপত্যকায় এসে বসবাস শুরু করেছিল। এরাই রচনা করেছিল ঋগ্বেদ এবং ঋগ্বেদ থেকে আমরা জানতে পারি যে, তারা অবিরাম সংগ্রাম করেছিল দুর্গ ও প্রাচীরবেষ্টিত নগরসমূহের অনার্য অধিবাসীগণের সঙ্গে। এই নগরসমূহের অনার্য অধিবাসীগণ কারা ? তাদের কথাই পরবর্তী অনুচ্ছেদে বলছি।

এই নগরবাসী অনার্যগণ (যাদের আর্যরা দস্যু, দাস, অনার্য, অসুর, পণি প্রভৃতি নামে অভিহিত করেছে) সিন্ধুসভ্যতার বাহকগণ ছাড়া আর কেউ নন। ১৯২২-২৩ খ্রিস্টাব্দে প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই লুপ্ত সভ্যতা আবিষ্কার করেন। পরে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণের গবেষণার ফলে জানা যায় যে এই সভ্যতা ভারতীয় এবং এর বয়স নির্ণীত হয় ২৫০০ হতে ৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। আরও প্রমাণিত হয় যে এ সভ্যতা প্রাগ্‌বৈদিক ও দেশজ।

মহেঞ্জোদারো আবিষ্কারের পরে অনুরূপ সভ্যতার নিদর্শন পাঞ্জাবের মণ্টগোমেরী জেলায় অবস্থিত হরপ্পা নগরীতে পাওয়া যায়। প্রথমে এ দুটিই এ সভ্যতার কেন্দ্র হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে আরও ১৫০টি কেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়েছে। তাদের অন্যতম হচ্ছে চানুধারো, লোথাল, নেভাদতি, নেভাসা, সোনাগাঁও, কোটদিজি, আমরি, চণ্ডোলী, রোজদি,

কালিবঙ্গান প্রভৃতি। এর ফলে এখন জানা গিয়েছে যে পাঁচ লক্ষ বর্গমাইল জুড়ে এই সভ্যতার বিস্তার ঘটেছিল।

সিন্ধুসভ্যতার যে একাধিক নগরী আবিষ্কৃত হয়েছে, তাদের সবগুলোর গঠন একই ছকে করা হয়েছিল। এর দ্বারা বিস্তৃত এই সভ্যতার ঐক্য প্রমাণিত হয়।

প্রধান প্রধান নগরীগুলির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পশ্চিমদিকে উচ্চভূমির উপর অবস্থিত সুবেষ্টিত দুর্গনগরী, আর পূর্বদিকে নীচের শহরে সাধারণ লোকের বসবাসের জন্য ঘরবাড়ি। এছাড়া, আরও বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উচ্চ স্তূপের উপর দেবতার মন্দির, সুনির্মিত জলাধার ও স্নানাগার আর বিরাট শস্যাগার। মনে হয় এই সকল শস্যাগারে শস্য সংরক্ষিত হত বিদেশে রপ্তানির জন্য। গম ও যবই প্রধান শস্য ছিল। এছাড়া ছিল মটর, কড়াই, খেজুর ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য। তিল ও সরিসা উভয়েরই চাষ হত। তার মানে, এখানকার অধিবাসীরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। এক শ্রেণী রন্ধনক্রিয়ায় তিলের তেল ব্যবহার করত, আর এক শ্রেণী ব্যবহার করত সরিষার তেল। এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং এ সম্বন্ধে আমরা পরে বলব। গৃহপালিত পশুর মধ্যে ছিল মেষ, ছাগল ও গরু এবং মুরগিও পালিত হত। শূকর, মহিষ ও হরিণের অস্থিও পাওয়া গিয়েছে। কেবল ঘোড়ার অস্থি পাওয়া যায়নি। এ থেকে প্রমাণ হয় যে তারা আর্য জাতির অন্তর্ভুক্ত লোক ছিল না। কেননা অশ্ববাহিত জঙ্গী রথে চেপেই আর্যরা এসেশে এসেছিল।

অস্ত্রশস্ত্র থেকে আরম্ভ করে নিত্য ব্যবহার্য অন্যান্য দ্রব্যসমূহের আকার-প্রকার ও গঠনপ্রণালীর ঐক্য দেখলে বিস্মিত হতে হয়। বস্তুত এত বড় এক বিরাট অঞ্চলে কারিগরিবিদ্যার অনুশীলনের ঐক্য সাধিত হয়েছিল। নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের মধ্যে তামার তৈরি বড়শিও পাওয়া গিয়েছে। তা থেকে আরও প্রমাণ হয় যে মহেঞ্জোদারোর লোকদের মধ্যে কেহ কেহ মৎস্য ভক্ষণ করত। তার মানে, মৎস্যভক্ষণকারী জাতিরাও মহেঞ্জোদারোয় উপস্থিত ছিল। এ সম্পর্কে আরও উল্লেখযোগ্য যে লোথালে চাউল ভক্ষণকারী জাতিও বিদ্যমান ছিল। এ দুই বৈশিষ্ট্যই বাঙালিদের নির্দেশ করে।

নানা শ্রেণীর শিল্পী ও কারিগরের উপস্থিতি আমরা এই সকল নগরীতে লক্ষ্য করি। হাতের কাজে তাদের বিশেষ দক্ষতা ছিল। এ দক্ষতার পরিচয় আমরা পাই লিপিযুক্ত নরম পাথরের সীল মোহর ও হাতের তাবিজ নির্মাণে, কণ্ঠহারের গুটি তৈরিতে, পাথরের ও ধাতুর তৈরি ভাস্কর্যে, বস্ত্র বয়ন প্রভৃতিতে।

ধর্মের দিক দিয়ে এই সকল নগরীর লোকেরা প্রত্ন-শিব ও তার প্রতীক লিঙ্গ এবং মাতৃকাদেবীর উপাসক ছিল। মহেঞ্জোদারো থেকে প্রাপ্ত চার ইঞ্চি উচ্চতাবিশিষ্ট যে নগ্নিকার মূর্তি পাওয়া গিয়েছে, এবং যাকে নৃত্যরতা রমণীমূর্তি বলে সনাক্ত করা হয়েছে, তা মাতৃদেবীর মূর্তি কিনা তা বিবেচ্য। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে প্রত্নশিবের মূর্তি ও এই নগ্নিকা উভয়েরই বাম হাত আদ্যোপান্ত বলয়বেষ্টিত। তবে মাটির তৈরি নগ্নিকা মাতৃদেবীর বহু প্রতিমূর্তি পাওয়া গিয়েছে। এছাড়া সীলমোহরগুলির উপর অঙ্কিত অশ্বত্থ পাতা ও স্বস্তিক চিহ্ন বোধ হয় ধর্মের সহিত তাদের সম্বন্ধ সূচিত করে। এখানে এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করা সম্ভবপর নয়, তবে ১৯২৮-৩১ খ্রিস্টাব্দে আমি যখন এ সম্বন্ধে অনুশীলন করেছিলাম, তখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম যে, পরবর্তীকালে হিন্দুসভ্যতার গঠনে বারো আনা ভাগ উপাদান যুগিয়েছিল সিন্ধুসভ্যতা, আর চার আনা ভাগ আর্যসভ্যতার বহিরাবরণে মণ্ডিত হয়েছিল। আমার 'Dynamics of Synthesis in Hindu Culture' ও 'সিন্ধুসভ্যতার স্বরূপ ও অবদান' দ্রষ্টব্য।

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে আমি মত প্রকাশ করেছিলাম যে পরবর্তীকালের ব্রাহ্মীলিপি সিন্ধুলিপি

থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল। তা যদি হয়, তা হলে বলতে হবে যে, ভারতীয় বর্ণমালার উৎপত্তি প্রাগার্য উৎস থেকে হয়েছে। এটা আমাদের দেশের ট্রাডিশন থেকেও প্রমাণিত হয়। ভারতীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারের প্রথম গ্রন্থ যা লিপিবদ্ধ হয়েছিল তা হচ্ছে 'মহাভারত'। এটা ব্যাসদেব কর্তৃক রচিত হয়েছিল ও গণেশ কর্তৃক লিপিবদ্ধ হয়েছিল। গণেশের অপর নাম বিনায়ক। ব্রাহ্মণ্যধর্মের দেবতামণ্ডলীতে গণেশের প্রবেশ প্রায় শেষের দিকে। রামায়ণ ও অনেক পুরাণে গণেশের উল্লেখ নেই। আদি মাহাভারতেও গণেশের উল্লেখ নেই। যাজ্ঞবল্ক্যই প্রথম গণেশের নামের উল্লেখ করেছেন—আনার্য রাক্ষস হিসাবে ও সর্বকাজে সিদ্ধিনাশক হিসাবে। পরে গণেশ সিদ্ধিদাতা হয়েছেন। প্রাচীন সাহিত্যেও বিনায়ক এক শ্রেণীর রাক্ষসের নাম হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে। এ সব থেকে মনে হয় যে আর্যরা লিখন প্রণালী জানত না, এবং পরবর্তীকালে যখন মহাভারত লিপিবদ্ধ করবার প্রয়োজন হয়, তখন আর্য-অন্তর জাতিসমূহের মধ্য হতে একজন লিপিকার সংগ্রহ করেছিল। এবং আর্যদের এই উপকার সাধনের জন্যই গণেশকে দেবতামণ্ডলীতে স্থান দেওয়া হয়েছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ব্যাস যে মাত্র মহাভারত রচনা করেছিলেন তা নয়। তিনি বেদকে শতশাখাযুক্ত চার ভাগে বিভক্ত করে 'বেদব্যাস' আখ্যা পেয়েছিলেন। তিনি অষ্টাদশ মহাপুরাণ, উপপুরাণসমূহ, বেদান্তদর্শন ও ভাগবতও রচনা করেছিলেন! কিন্তু এ সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তর আমি আজও পাইনি। তা হচ্ছে তথাকথিত আর্যদের মধ্যে বড় বড় পণ্ডিত থাকা সত্ত্বেও বেদ সঙ্কলন ও পুরাণ, মহাভারত প্রভৃতি রচনার গুরুত্বপূর্ণ কাজ একজন অনার্য রমণীর জারজ সন্তানের উপর ন্যস্ত হয়েছিল কেন ? এই কিংবদন্তীর মধ্যেই ভারতীয় সংস্কৃতির এক গূঢ় রহস্য নিহিত আছে।

সিন্ধুসভ্যতার প্রাদুর্ভাবের সময়ই আর্যদের প্রথম দল ভারতে এসেছিল। সময়টা বোধহয় ২০০০ থেকে ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের অন্তর্বর্তী কোন কাল হবে। আর্যরাই সিন্ধুসভ্যতার পতন ঘটিয়েছিল। তবে এখানে একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। সেটা হচ্ছে এই যে, সিন্ধুসভ্যতা ও বৈদিকসভ্যতা অভিন্ন—এটা ভ্রান্ত মতবাদ। এ মতবাদটা যে সম্পূর্ণ ভুল, তার প্রমাণ এখানে দিচ্ছি। প্রথম প্রমাণ হচ্ছে নৃতাত্ত্বিক প্রমাণ। সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রগুলি থেকে যে কঙ্কালাস্থি পাওয়া গিয়েছে, তার সংখ্যা হচ্ছে ৩২৫—মহেঞ্জোদারো থেকে প্রাপ্ত ৪১টি কঙ্কাল, হরপ্পা থেকে প্রাপ্ত ২৬০টি কঙ্কাল, লোথাল থেকে প্রাপ্ত ২১টি কঙ্কাল ও কালিবঙ্গান থেকে প্রাপ্ত বাকি কঙ্কাল পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এই কঙ্কালাস্থিসমূহ সম্পর্কে নৃতত্ত্ববিদগণ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তা হচ্ছে—হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো ও লোথালের লোকেরা অধিকাংশই দীর্ঘশিরস্ক, বিস্তৃত নাসা ও আকারে লম্বা ছিল। কিন্তু হরপ্পা যুগে গুজরাটে ও সিন্ধুপ্রদেশে বিস্তৃতশিরস্ক জাতির বিদ্যমানতাও লক্ষিত হয়েছে। তার মানে সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রগুলিতে প্রধানত ভূমধ্যসাগরীয় প্রাগদ্রাবিড় জাতিরাই বাস করত, তবে আলপীয়রাও সেখানে ছিল। যদি সিন্ধুসভ্যতা বৈদিক আর্যগণ কর্তৃক সৃষ্ট হয়ে থাকত তা হলে আমরা সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্রগুলিতে নিশ্চয়ই নর্ডিক বা বৈদিক আর্যগণের কঙ্কালাস্থি পেতাম। দ্বিতীয়ত, এটা সর্ববাদিসম্মত যে আর্যরা ঘোড়াকে পোষ মানিয়েছিল ও নানারূপ কাজে অশ্বকে ব্যবহার করত। কিন্তু সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রগুলিতে অশ্বের অস্থি পাওয়া যায়নি। তৃতীয়ত, সিন্ধুসভ্যতার স্বরূপের সঙ্গে ঋগ্বেদে বর্ণিত বৈদিক আর্যসভ্যতার স্বরূপের সম্পূর্ণ পার্থক্য ছিল। সিন্ধুসভ্যতার স্রষ্টাগণ নাগরিক জীবনযাপন করতেন ও নগর নির্মাণে দক্ষ ছিলেন। বৈদিক আর্যরা গ্রাম-কেন্দ্রিক গোষ্ঠী জীবনযাপন করতেন। আদিতে তাঁরা যে নগর নির্মাণ করতেন, তার কোন আভাসই ঋগ্বেদে পাওয়া যায় না। বরং তাঁরা নগরধ্বংসকারী হিসাবে নিজেদের গৌরব পুনঃপুন প্রকাশ করেছেন। সে কারণে তাঁরা

ইন্দ্রকে পুরন্দর আখ্যা দিয়েছিলেন। এছাড়া, সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রসমূহে প্রতীকোপসনা, মূর্তি পূজা, লিঙ্গ পূজা প্রভৃতির প্রচলন ছিল। প্রত্ন-শিব ও মহাশক্তিরূপিণী জগন্মাতাও তথায় পূজিত হতেন। বৈদিক ধর্মে মূর্তিপূজা অজ্ঞাত, ও দেবদেবীরূপে শিবশক্তি অখ্যাত এবং লিঙ্গপূজা নিন্দিত। সুতরাং বিচার করে দেখলে বোঝা যাবে যে দুটি সভ্যতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও পৃথক। বস্তুত দুই সভ্যতার মধ্যে সংঘর্ষের বহু বিবরণ ঋগ্বেদে আছে। ছয়ের মণ্ডলে (৬।২।৭৫) উল্লিখিত হয়েছে শৃঞ্জয় নামক আর্যগোষ্ঠী ইন্দ্রের সহায়তায় হরিয়ুপীয়ার (হরপ্পার) পূর্বভাগে অবস্থিত বরশিখ বংশীয় যজ্ঞপাত্রধ্বংসকারী বৃষীবৎগণকে নিধন করেছিল। আটের মণ্ডলে (৮।৯৬।১৩) উল্লিখিত হয়েছে যে অংশুমতী নদীর তীরে কৃষ্ণ নামক জনৈক অসুর অধিপতি দশ সহস্র সৈন্য নিয়ে আর্যদের আক্রমণ করতে উদ্যত হলে আর্যরা তাদের পরাভূত করবার জন্য ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করেছিল। দশের মণ্ডলে (১০।২২।৮) ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা জানান হয়েছে—'আমাদের চতুর্দিকে দস্যু জাতি আছে, তারা যজ্ঞকর্ম করে না। তারা কিছু মানে না, তাদের ক্রিয়া স্বতন্ত্র; তারা মনুষ্যের মধ্যে গণ্য নয়। তাদের নিধন কর।' ইন্দ্র পিপ্র নামক নগর ধ্বংস করেছিল (১।৫১।৫) ও শুষ্ণ, শম্বর ও অর্বুদ নামক অসুরগণের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল (১।৫১।৬ ; ১।১১।৭১); ইন্দ্র বৈলস্থানকের (বেলুচিস্তানের ?) অন্তর্গত মহাবৈলস্থনগর ধ্বংস করেছিল (১।১৩১।৩); এছাড়া ইন্দ্র সরস্বতী নদীর তীরস্থ নৈতন্ধব ও ব্যার্ন নামক নগরদ্বয় ও নারমিনি নামক অপর এক নগরও ধ্বংস করেছিল; ইন্দ্র দ্যৌ নামক অসুরকে বধ করেছিল; এছাড়া ইন্দ্র দস্যু ও অনার্য শিম্যুদের (১।১০০।১৮) প্রহার করেছিল, ও দস্যুদের নগরসমূহ ধ্বংস করেছিল (১।১০৩।৩)। ইন্দ্র হব্যদাতা দিবোদাসকে শম্বরের পাষাণনির্মিত শত সংখ্যক পুরী প্রদান করেছিল (৪।৩০।২০)। বস্তুত প্রথম মণ্ডলের ১।১২৯ হতে ১।১৩৩ সূক্তে আর্যদের সঙ্গে অনার্যদের যুদ্ধ ও বৈরিতার অনেক উল্লেখ আছে। মনে হয় সিন্ধুসভ্যতার বাহকগণের নগরসমূহ ধ্বংস করে আর্যরা তাদের শস্যাগার লুণ্ঠন করেছিল, কেননা আটের মণ্ডলে (৮।৯৭।১) বলা হয়েছে যে ইন্দ্র অসুরগণকে পরাভূত করে তাদের নিকট হতে অনেক ভোক্তব্য দ্রব্য আহরণ করেছে। সব চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হচ্ছে আটের মণ্ডলের (৮।৯৭।২) প্রার্থনা—'ইন্দ্র, অসুরগণকে অশ্ব দিও না।' ঋগ্বেদে অসুর জাতির বহু অধিপতির নাম আছে। তাদের অন্যতম হচ্ছে শম্বর, শুষ্ণ, অর্বুদ, কৃষ্ণ, এতশ, দশব্রজ, নববাস্ত ও বৃহদ্রথ (১০।৪৯।৬)।

কিন্তু আর্যদের গোড়ার দিকের এই বৈরিতা, আর পরবর্তীকালে ছিল না। পঞ্চনদ থেকে তাঁরা যতই পূর্বদিকে অগ্রসর হলেন, ততই তাঁরা এ-দেশের লোকের সংস্পর্শে এলেন। তাঁরা এ-দেশের মেয়েদের বিয়ে করলেন। যখন অনার্য রমণী গৃহিণী হলেন তখন তাঁদের ধর্মকর্মের উপর তার প্রতিঘাত পড়ল। ক্রমশ তাঁরা বৈদিক যজ্ঞাদি ও বৈদিক দেবতাগণকে পশ্চাতে অপসারণ করলেন। আর্য ও অনার্যদের সংশ্লেষণে পৌরাণিক দেবতা মণ্ডলীর সৃষ্টি হল, এবং তথাকথিত আর্য ব্রাহ্মণগণ এই সকল নতুন দেবতা পূজার পত্তন করলেন।

মনে হয় সিন্ধুসভ্যতার গঠনে বাঙালিদেরও কিছু অবদান ছিল। আমরা আগেই বলেছি যে সিন্ধু ও গুজরাট-এ হরপ্পা যুগে এক বিস্তৃতশিরস্ক জাতিও ছিল। বাঙালিরাও বিস্তৃতশিরস্ক জাতি (লেখকের 'বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' দেখুন) এবং তারা অবৈদিক আর্যজাতির এক শাখা যাদের নাম নৃতত্ত্ববিদগণ 'আলপীয়' দিয়েছেন। সিন্ধুসভ্যতার সঙ্গে বাঙলার সম্পর্ক সূচিত হয় সীলমোহরের উপর হস্তি (বাঙলার পাঞ্চ-মার্কযুক্ত মুদ্রার ওপর খোদিত হস্তির সঙ্গে এর বিশেষ সাদৃশ্য আছে) ও ব্যাঘ্রের প্রতিকৃতি, মৎস্য ভক্ষণ এবং সরিষার তৈল ও চাউলের

ব্যবহার থেকে। ব্যাঘ্র প্রধানত বাঙলার জন্তু, সুতরাং সে সম্বন্ধে বিশেষ বক্তব্য রাখবার প্রয়োজন নেই। হস্তিকে বাঙলারই একজন মুনি পালকাপ্য প্রথম পোষ মানিয়েছিলেন এবং হস্তিচিকিৎসা সম্বন্ধে একখানি বইও লিখেছিলেন। সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রসমূহে সূতীবস্ত্রও পাওয়া গেছে এবং সূতীবস্ত্র বয়নের জন্য বাঙলার নাম বিশ্ববিখ্যাত। মনে হয়, বাঙালি বণিকগণ হাতি, সূতী বস্ত্র, তামা প্রভৃতি সিন্ধু উপত্যকা, সৌরাষ্ট্র ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে নিয়ে গিয়ে সেখানকার বণিকদের সঙ্গে বাণিজ্য করত। লোথালে বাঙালির খাদ্য চাউল প্রাপ্তি ও মহেঞ্জোদারোয় সরিষার তৈলের ব্যবহার সেই ইঙ্গিতই করে। তবে বাঙালি বণিকদের সঙ্গে এই সকল দেশের যে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল তার প্রমাণ হচ্ছে বাঙলাদেশে দেবীর বাহন সিংহ। একদা সিংহ বাঙলাদেশেও পাওয়া যেত। ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত ক্রীট দ্বীপ থেকে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে মাতৃদেবীর সঙ্গে সিংহের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং দেবীর বাহন হিসাবে সিংহের কল্পনা যে বাঙালিরাই ওখানে নিয়ে গিয়েছিল তা সহজেই ভাবতে পারা যায়।

এ সম্পর্কে আরও বিবেচ্য যে বাঙালি বণিকরা আনাতলিয়া অঞ্চলে গিয়ে হট্টস (হিটটী) রাজ্য স্থাপন করেছিল কিনা? কেননা প্রাচীন বাঙলার বণিকদের নাম ছিল হট্ট, যা সংস্কৃত ভাষায় প্রবেশ করেছে এবং যা থেকে বর্তমান 'হাট', হাটী' প্রভৃতি শব্দ উদ্ভূত হয়েছে। তবে বাঙালিরা যে এক সময় আনাতলিয়া বা কৃষ্ণসাগরের উপকূলস্থ অঞ্চলে বসবাস করত তার প্রমাণ আমরা প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য থেকে পাই। ভেলেরিয়াস ফ্লাকাস তাঁর 'আরগণটিকা'য় বলেছেন যে, কৃষ্ণসাগরের উপকূলে কলচিয়ানদের সঙ্গে জেসনের যুদ্ধে (১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) গঙ্গারিডি দেশের লোকেরা অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়েছিল। ভার্জিলও তাঁর 'জর্জিকাস' গ্রন্থে লিখে গিয়েছেন সে গঙ্গারিডি দেশের লোকদের বীরত্ব আমি মন্দিরদ্বারে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখতে চাই। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে খ্রিস্টপূর্বাব্দ দ্বিতীয় সহস্রকে বাঙালিরা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলেও অপরিচিত ছিল না।

পরবর্তীকালের সাহিত্য থেকে আমরা জানতে পারি যে, বাঙালায় আলপীয়দের 'অসুর' বলা হত। মহাভারত অনুযায়ী বাঙলা ও ওড়িশার জনসমূহ অসুর নৃপতি বলিরাজার মহিষী সুদেষ্ণার গর্ভজাত সন্তান। 'মঞ্জুশ্রীমুলকল্প' নামক একখানি প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থে বাঙলার আর্যভাষাকে অসুর ভাষা বলা হয়েছে। গ্রিয়ারসন এর নাম দিয়েছিলেন Outer Aryans-দের ভাষা। ঋগ্বেদের সর্বত্রই আমরা সিন্ধুবাসী অসুরদের উল্লেখ পাই। তাদের বৈশিষ্ট্য ছিল নগর নির্মাণ। অসুররাই যে স্থাপত্য বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিল তা আমরা ময়াসুরের কাহিনী থেকে জানতে পারি। সুতরাং সিন্ধুর অসুররা যে বাঙালিদের পূর্বপুরুষ তা সহজেই অনুমেয়। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে (১।৫৩) বর্ণিত বঙ্গৃদ নামক অসুর বাঙালি কিনা তা বিবেচ্য। অসুর সম্বন্ধে আলোচনা পরবর্তী নিবন্ধে দেখুন।

৪
বৈদিক যুগের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

আর্যদের সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ হচ্ছে ঋগ্বেদ সংহিতা। এর এক-একটি শ্লোকের নাম 'ঋক্'। কয়েকটা ঋক্ নিয়ে এক বা একাধিক দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত স্তুতিকে বলা হয় 'সূক্ত'। আবার অনেকগুলি সূক্ত নিয়ে একটা খণ্ড তৈরি করা হয়েছে। এরূপ এক-একটা খণ্ডকে 'মণ্ডল' বলা হয়। ঋগ্বেদ সংহিতায় মোট দশটা মণ্ডল আছে। সব মণ্ডলে একই নির্দিষ্ট সংখ্যক সূক্ত নেই।

সূক্তগুলো রচনা করতেন ঋষিরা। তবে এ সম্বন্ধে বিভিন্ন মণ্ডলের মধ্যে একটা প্রভেদ আছে। প্রথম মণ্ডলের সূক্তগুলো অনেক ঋষি দ্বারা রচিত হয়েছিল। যেমন বিশ্বামিত্র-পুত্র মধুছন্দার দ্বারা ১১টি, মধুছন্দার পুত্র জেতৃ কর্তৃক একটি, দিবোদাস-পুত্র পুরুচ্ছেদের দ্বারা ১৩টি, শক্তি-পুত্র পরাশয়ের দ্বারা ৯টি, অজীগর্ত-পুত্র শূনঃশেপের দ্বারা ৭টি, মরীচি-পুত্র কশ্যপের দ্বারা একটি, দীর্ঘতমা ও তৎপুত্রের দ্বারা ৩৬টি, অগস্ত্যের দ্বারা ২৭টি, গৌতম ও তৎপুত্রের দ্বারা ২৭টি, অঙ্গিরাবংশীয়দের দ্বারা ৩২টি, কণ্ববংশীয়দের দ্বারা ২৭টি ও অন্য কয়েকজন ঋষি দ্বারা একটি। নবম ও দশম মণ্ডলও অনেক ঋষি দ্বারা রচিত হয়েছিল। বাকি মণ্ডলগুলি এক এক বিশেষ ঋষি পরিবার দ্বারা রচিত। যেমন দ্বিতীয় মণ্ডল ভৃগু বংশীয় গৃৎসমদ ও তদ্বংশীয় ঋষিগণ দ্বারা, তৃতীয় মণ্ডল বিশ্বামিত্র ও তদ্বংশীয় ঋষিগণ দ্বারা, চতুর্থ মণ্ডল বামদেব ও তদ্বংশীয় ঋষিগণ দ্বারা, পঞ্চম মণ্ডল অত্রি ও তদ্বংশীয় ঋষিগণ দ্বারা, ষষ্ঠ মণ্ডল ভরদ্বাজ ও তদ্বংশীয় ঋষিগণ দ্বারা, সপ্তম মণ্ডল বশিষ্ঠ ও তদ্বংশীয় ঋষিগণ দ্বারা ও অষ্টম মণ্ডল কণ্ব ও তদ্বংশীয় ঋষিগণ দ্বারা। নবম মণ্ডলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর সবগুলি সূক্তই সোম দেবতার স্তুতি। এর সঙ্গে সামবেদের কিছু সাদৃশ্য আছে। আর দশম মণ্ডলের সঙ্গে অথর্ববেদের অনেক সামঞ্জস্য আছে।

ঋগ্বেদের সূক্তগুলির অভ্যন্তরীণ প্রমাণ থেকে বুঝতে পারা যায় যে ঋগ্বেদের সূক্তগুলি বিভিন্ন সময়ে রচিত হয়েছিল। এমন কি এর মধ্যে এমন অনেক সূক্ত আছে যা আর্যরা এদেশে আসার আগেই তাদের আদিম বাসস্থানে রচিত হয়েছিল। তা ছাড়া, সূক্তগুলি একাধিক পুরুষ (generations) কর্তৃক রচিত হয়েছিল। সেজন্য পণ্ডিতগণ ঋগ্বেদের মধ্যে অন্তত সাতটি স্তরের সন্ধান পেয়েছেন। দশম মণ্ডল অন্য সব মণ্ডলের চেয়ে আধুনিক। আর অষ্টম মণ্ডলের ১১টি সূক্ত আছে, যেগুলিকে 'বালখিল্য' বলা হয়। সায়ন ঋগ্বেদের টীকা লিখেছেন, কিন্তু এই ১১টি সূক্তের টীকা লেখেননি। সেজন্য এগুলির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস যে সূক্তগুলি একত্রিত করে ঋগ্বেদের সংকলন করেছিলেন সেগুলি নানা সময়ে রচিত।

পূর্ব অনুচ্ছেদে যে সকল কথা বলা হল, তা বলবার উদ্দেশ্য এই যে, ঋগ্বেদে কোন বিশেষ সময়ের সামাজিক বা নৃতাত্ত্বিক চিত্র নেই। বিভিন্ন যুগের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, ধর্মানুষ্ঠান ও যাগযজ্ঞের চিত্রই এতে পাওয়া যায়। এমন কি আর্যরা এদেশে আসবার আগেকার রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহারের সন্ধানও এতে পাওয়া যায়। কিন্তু কোন্‌টা কোন্ যুগের সে সম্বন্ধে কোন বিশেষ অনুশীলন হয়নি।

শতপথ ব্রাহ্মণের প্রথম কাণ্ডের ২,৩,৭ ও ৮ অধ্যায়ে বলিদান সম্বন্ধে এক বিস্ময়কর

বর্ণনা আছে। সেখানে বলা হয়েছে—'প্রথমত, দেবতারা একটি মনুষ্যকে উৎসর্গ করলেন, তার উৎসর্গীকৃত আত্মা, অশ্বদেহে প্রবেশ করল। দেবতারা অশ্বকে বলিস্বরূপ উৎসর্গ করলেন; উৎসর্গীকৃত আত্মা অশ্বদেহ হতে পুনরায় বলীবর্দে প্রবেশ করল। বলীবর্দকে উৎসর্গ করা হলে ওই আত্মা মেষদেহে প্রবিষ্ট হল; মেষ উৎসর্গীকৃত হলে, উহা ছাগদেহে প্রবিষ্ট হল। ছাগ উৎসর্গীকৃত হলে পৃথিবীতে প্রবেশ করল। দেবতারা পৃথিবী খনন করে ধান্য ও যব আকারে ওই আত্মাকে পেলেন। তদবধি সকলে এখনও ধান্যাদি কর্ষণ দ্বারা পেয়ে থাকে।' শতপথ ব্রাহ্মণের এই বিবরণটা অত্যন্ত অর্থবাহক। এর মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় লুক্কায়িত আছে আর্যদের সমস্ত সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক ইতিবৃত্ত। এ থেকে বুঝতে পারা যায় যে, আর্যরা প্রথমে ভূমিকর্ষণ দ্বারা ধান্যাদি উৎপাদন করতে জানতেন না। তাঁরা ছিল যাযাবর জাতি, এবং সম্ভবত তাঁদের আদিম বাসস্থান ছিল কোন শীতপ্রধান দেশে। সেখানে শরীরকে গরম রাখবার জন্য তাঁরা মাংসাশী ছিলো। দেবতার নামে তারা কোন বিশেষ জীব উৎসর্গ আরম্ভ করেছিলেন নরমেধ যজ্ঞ দিয়ে। তারপর ক্রমিক বিবর্তনের ধারাবাহিকতার ভিতর দিয়ে তাঁরা আরম্ভ করেছিলেন অশ্বমেধ, গোমেধ, মেষমেধ ও ছাগমেধ যজ্ঞ। এই ছাগমেধ যজ্ঞের পরই তারা ভূমিকর্ষণ দ্বারা শস্য উৎপাদন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেছিলেন।

অশ্বমেধ, গোমেধ ইত্যাদি যজ্ঞের পর আর্যরা উৎসর্গীকৃত পশুর মাংস ভক্ষণ করত। বস্তুত অশ্বমেধের রান্না মাংস খাবার জন্য ঋষিদের রসনায় জল গড়াত। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে (১৷১৬২৷১১) বলা হয়েছে—'হে অশ্ব! অগ্নিতে পাক করবার সময় তোমার গা দিয়ে যে রস বেরোয় এবং যে অংশ শূলে আবদ্ধ থাকে, তা যেন মাটিতে না পড়ে ও ঘাসের সঙ্গে না মিশে যায়। দেবতারা লালায়িত হয়েছেন, তাঁদের দেওয়া হোক।' আবার বলা হয়েছে—'যে কাষ্ঠদণ্ড মাংস-পাক পরীক্ষার্থে ভাণ্ডে দেওয়া হয়, যে সকল পাত্রে ঝোল রক্ষিত হয়, যে সকল আচ্ছাদন দ্বারা উষ্ণতা রক্ষিত হয়....এরা সকলেই অশ্বের মাংস প্রস্তুত করছে।' (১৷১৬২৷১৩)। ঋগ্বেদের এ সকল বর্ণনা থেকে বুঝতে পারা যায় যে, অশ্বের মাংস বেশ রসাল করে ঝোল-সহ রান্না করা হত, এবং সে মাংসের জন্য যে মাত্র দেবতাগণই লালায়িত হয়ে উঠতেন তা নয়; জনসাধারণও সে মাংসের টুকরো পাবার জন্য চারদিকে ভীড় করে থাকত ও রান্নার সুঘ্রাণ গ্রহণ করত। কেননা, বলা হয়েছে—'যাঁরা চারদিক থেকে অশ্বের মাংস রান্না দেখছে, যারা বলছে যে গন্ধ মনোরম হচ্ছে—এখন নামাও, যারা মাংস পাবার জন্য অপেক্ষা করছে তাদের সঙ্গে আমাদের সংকল্প এক হউক' (১৷১৬২৷১২)।

শুধু অশ্ব নয়, মহিষ, বৃষ, গাভী ও গোবৎসও আর্যদের প্রিয় খাদ্য ছিল। ষষ্ঠমণ্ডলে (৬৷১৭৷১১) বলা হয়েছে যে ইন্দ্রের জন্য শত মহিষ পাক করা হচ্ছে। দশম মণ্ডলের (১০৷৮৯৷১৪; ১০৷৮৬৷১৩; ১০৷৮৬৷১৪) ও অন্য কয়েক স্থানে বৃষ ভক্ষণের কথা পাওয়া যায়। বলা হয়েছে—'আমার জন্য পঞ্চদশ এমন কি বিংশ বৃষ পাক করে দাও, আমি খেয়ে শরীরের সুস্থতা সম্পাদন করি, আমার উদরের দুপার্শ্ব পূর্ণ হউক।' (১০৷৮৬৷১৪)। বস্তুত বৈদিক যুগে বৃষ আর্যগণের প্রিয় খাদ্য ছিল। দশম মণ্ডলে ৮৯ সূক্তে গোহত্যা স্থানের উল্লেখ আছে। গোহত্যা বিশেষরূপে প্রচলিত না থাকলে, তার জন্য নির্দিষ্ট স্থানের (Slaughter House) উল্লেখ থাকত না। অতিথি এলেও তাকে গরুর মাংস রান্না করে খাওয়ান হত। সেজন্য তার আর এক নাম ছিল 'গোঘ্ন'।

বস্তুত আর্যরা যে এক বর্বর জাতি ছিল, তা গত পঞ্চাশ বছরের প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার ও বৈদিক অনুশীলনের ফলে জানা গিয়েছে। এ সম্বন্ধে প্রথম মন্তব্য প্রকাশ করেন বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ ভি. গর্ডন চাইলড ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক 'দি আরিয়েনস'-এ।

তিনি বলেছিলেন যে, আর্যদের বর্বরতা বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছিল তাদের কার্যকলাপে।
জগতের যেখানেই তারা গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিল, সেখানেই তারা সেখানকার উন্নত
সভ্যতাকে ধ্বংস করেছিল। চাইলড-এর এই মন্তব্য পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত প্রাগার্য সভ্যতাসমূহের
সঙ্গে মিলিয়ে দেখে পণ্ডিতসমাজ এটা একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। সর্বত্রই তারা উন্নতমানের
প্রাগার্য সভ্যতাকে ধ্বংস করে নিজেদের হীন ও বর্বর সভ্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বর্তমান
শতাব্দীর দুইয়ের দশকের শেষদিকে বর্তমান লেখকই প্রথম প্রমাণ করেন যে, মাত্র এক জায়গাতেই
আর্যদের এই প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছিল। সেটা হচ্ছে ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষে এসে তারা সিন্ধু উপত্যকায়
যে উন্নত মানের সভ্যতার সম্মুখীন হয়েছিল, এবং যাদের বাহকদের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম
চালিয়েছিল (যার প্রমাণ ঋগ্বেদের মধ্যেই আছে) শেষ পর্যন্ত কিন্তু তাদের কাছেই তাদের
মাথা অবনত করতে হয়েছিল। কেননা, সিন্ধুসভ্যতার মধ্যেই আমরা নিহিত দেখি পরবর্তীকালে
উদ্ভূত হিন্দুসভ্যতার মূল উপাদানসমূহ।

আর্যরা ছিল যোদ্ধার জাত, আর সিন্ধুসভ্যতার বাহকরা ছিল বণিকের জাত। ঋগ্বেদের
পুরোহিতেরা খুব আড়ম্বরবহুল যজ্ঞীয় ক্রিয়াকাণ্ডের সৃষ্টি করেছিল, এবং রাজারাজড়ারা সে
সকল যজ্ঞীয় ক্রিয়াকাণ্ড করা মহাগৌরবের বিষয় বলে মনে করত। রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়
বলেছেন—'পঞ্চনদের প্রাদুর্ভাবের সময় রাজপদের তত সম্মান হয় নাই। সকলেই যোদ্ধা,
তাহাদের মধ্যে যিনি প্রধান, যাঁহার অধিনেতৃত্বে দেশ-প্রদেশ করায়ত্ত করা হইত, তিনি নেতার
স্বাভাবিক সম্মান পাইতেন, এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতেন।' তখন পুরোহিতরা তাঁদের দ্বারা
অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করাতেন। আর্যেরা অশ্ববাহনে এদেশে এসেছিলেন। এদেশে অশ্ব ছিল
না। তার প্রমাণ সিন্ধুসভ্যতার নিদর্শনসমূহের মধ্যে কোথাও অশ্বের কঙ্কাল পাওয়া যায়নি।
সিন্ধুসভ্যতার বাহকদের ছিল গাভী ও বলীবর্দ। সমস্ত ঋগ্বেদখানা পড়লে বুঝতে পারা যায়
যে আর্যরা ছিল একটা হাঘরে জাত। ধর্মগ্রন্থ হিসাবে বেদের উৎপত্তি হলেও সমগ্র বেদখানাতে
উলঙ্গভাবে প্রকটিত হয়েছে দেবতাদের কাছে, তাদের বৈষয়িক প্রার্থনা—ঋগ্বেদের প্রায়
১০,০০০ মন্ত্রের মধ্যে হাজারখানেকেতে শুধু একই কথা বলা হয়েছে—দাও আমাদের শত্রুর
ধন, দাও আমাদের শত্রুর সম্পদ, দাও আমাদের শত্রুর গাভী, দাও আমাদের শত্রুর মেয়েছেলে
ইত্যাদি। সর্বত্রই বলা হয়েছে—'আমার শত্রুকে ধ্বংস কর, তাদের সকল ধন আমাদের দাও,
অন্য কাউকে দিও না। কেবলমাত্র আমার মঙ্গল কর।' প্রথম মণ্ডলের পাঁচ-এর সূক্তে বলা
হয়েছে—'শত্রুরা যার রথযুক্ত অশ্বদ্বয়ের সম্মুখীন হতে পারে না, সেই ইন্দ্র আমাদের ধন
প্রদান করুন, স্ত্রী প্রদান করুন, অন্ন নিয়ে আমাদের নিকট আগমন করুন।' (১।৫।৩)।
তার মানে এ তিনটা জিনিসের আর্যদের অভাব ছিল—ধন, স্ত্রী ও অন্ন। আবার আটের
সূক্তে প্রার্থনা করা হয়েছে—'হে ইন্দ্র! আমাদের রক্ষণার্থে সম্ভোগযোগ্য, জয়শীল, সদা
শত্রুবিজয়ী ও প্রভূত ধন দাও।' (১।৮।১)। 'যে ধনদ্বারা নিরন্তর মুষ্টিপ্রহার দ্বারা আমরা
শত্রুকে নিবারণ করব অথবা তোমার দ্বারা রক্ষিত হয়ে অশ্বদ্বারা শত্রুকে নিবারণ করব' (১।৮।২)।
'হে ইন্দ্র! তোমার দ্বারা রক্ষিত হয়ে আমরা কঠিন অস্ত্র ধারণ করে যুদ্ধে স্পর্ধাযুক্ত শত্রুকে
জয় করব' (১।৮।৩)। অশ্বই আর্যদের সম্বল ছিল, তারা সিন্ধুসভ্যতার বাহকদের কাছ থেকে
গাভী চুরি করে এনেছিল। দূতী সরমাকে পাঠিয়ে তারা এর সন্ধান করেছিল। তারপর তারা
গুহার মধ্যে রক্ষিত গাভীসমূহ অপহরণ করেছিল। (১।৬।৫)। গাভী যে আর্যদের ছিল না,
তা তাদের প্রার্থনা থেকেই বুঝতে পারা যায়। তারা প্রার্থনা করত—'হে ইন্দ্র! শত্রু বধকালে
এ উভয় জগৎ তোমাকে ধারণ করতে পারে না, তুমি স্বর্গীয় জল জয় কর, আমাদের সম্যক্‌রূপী
গাভী প্রেরণ কর।' (১।১০।৮)। গাভী লাভার্থে ইন্দ্র সিন্ধুসভ্যতার বাহকদের নগরসমূহ বিদীর্ণ

করেছিল (১।৫৩।৭, ৪।৬।১৩, ৪।২৬।১)। সেজন্য ইন্দ্রের অপর নাম হয়েছিল 'পুরন্দর'। একমাত্র সিন্ধুসভ্যতার বাহকরাই নগরে বাস করত। আর্যরা বাস করত গ্রামে ; কেননা, তাদের সমাজ ও সংস্কৃতি ছিল গ্রামীণ।

ন্যূনপক্ষে ঋগ্বেদের সাতটি কাল-স্তর আছে। সুতরাং শেষের দিকে রচিত সূক্তসমূহ থেকে আমরা জানতে পারি যে এদেশের উন্নত সভ্যতার সংস্পর্শে এসে তারা বর্বর জাতি থেকে সুসভ্য জাতিতে পরিণত হয়েছিল। এটা ঘটেছিল পরবর্তীকালে আর্যরা যখন এদেশের মেয়েদের বিবাহ করেছিল। এই সকল মেয়েদের প্রভাবই আর্যদের সুসভ্য করে তুলেছিল। এ কথা আর্যরা ঋগ্বেদের এক জায়গায় স্বীকার করেই ফেলেছিল। ষষ্ঠ মণ্ডলের ১-এর সূক্তে বলা হয়েছে যে 'মেয়েরাই বস্ত্র বয়ন করতে জানে, আমরা জানি না।' এবং মনে হয় আদিম সমাজে মেয়েরাই যেমন চাষবাস করে, আর্যসমাজেও তেমনই অনার্যরমণীরাই এসে চাষবাসের প্রবর্তন করেছিল।

ইন্দ্রের কাছে আর্যদের অনবরত স্ত্রীধন পাবার প্রার্থনা থেকে বুঝতে পারা যায় যে, যে-বিপর্যয়ের প্রতিঘাতে আর্যরা এদেশে আসতে বাধ্য হয়েছিল, তাতে তাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি যথাযথ সংখ্যক মেয়েছেলে সঙ্গে নিয়ে আসা। সেই জন্যই এদেশের মেয়েছেলের ওপর তাদের অত্যন্ত লোভ ছিল, এবং তাদের পাবার জন্যই তারা ইন্দ্রের কাছে পুনঃপুন প্রার্থনা করত। এখানে একটা কথা বলা প্রাসঙ্গিক হবে। পত্নী অর্থে 'বধূ' শব্দের প্রয়োগ। 'বধূ' শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে যাকে বহন করে আনা হয়েছে [বহ্+উ (র্ম)]। তার মানে, যাকে কেড়ে আনা হয়েছে। নৃতত্ত্বের ভাষায় যাকে 'ম্যারেজ বাই ক্যাপচার' বলা হয়। আরও একটা জিনিস বরাবর আমার কৌতূহল জাগিয়েছে। স্বামীকে 'আর্যপুত্র' বলে সম্বোধন করা হত কেন? কোন ইংরেজ বা জার্মান মহিলা তো কখনও স্বামীকে ওহে ইংরেজপুত্র বা ওহে জার্মানপুত্র বলে অভিহিত করে না। কোন বাঙালি মেয়েও তার স্বামীকে ওগো বাঙালির ছেলে বলেও সম্বোধন করে না। সেজন্য আমার মনে হয় স্বামীকে আর্যপুত্র বলে অভিহিত করবার একটা গূঢ় অর্থ আছে। মনে হয় এটা সে-যুগের সম্বোধনের প্রতিধ্বনি, যে-যুগে স্বামী আর্য হতেন ও স্ত্রী অনার্য হত এবং স্ত্রী গৌরবার্থে স্বামীকে 'আর্যপুত্র' বলে সম্বোধন করত। বস্তুত সমগ্র আর্য সংস্কৃতিটা ছিল প্রতিলোম অভিমুখী।

আর্যরা যখন পঞ্চনদে এসে উপস্থিত হয়েছিল, তখন তারা সেখানে চারি জাতির বিদ্যমানতা লক্ষ্য করেছিল। ঋগ্বেদের বহু স্থানে তাদের নামের উল্লেখ আছে। এই চারি জাতি হচ্ছে অসুর, পণি, দস্যু ও দাস। আমি অন্যত্র নৃতত্ত্বের সংজ্ঞা অনুযায়ী এদের সনাক্ত করবার চেষ্টা করেছি। অসুরদের আমি বলেছি 'আলপীয়'-গোষ্ঠীভুক্ত; পণিদের 'ভূমধ্য-সাগরীয়'-গোষ্ঠীভুক্ত, দস্যুদেরও 'ভূমধ্য-সাগরীয়'-গোষ্ঠীভুক্ত লোকদের, দ্রাবিড় জাতি, ও দাসেদের ভারতের দেশজ নিষাদ বা 'প্রটোঅস্ট্রালয়েড'-গোষ্ঠীভুক্ত লোক। এই তিন জাতিরই কঙ্কাল আমরা সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রসমূহে পেয়েছি। যাঁরা ঋগ্বেদের অনুবাদ করেছেন বা ঋগ্বেদ সম্বন্ধে অনুশীলন করেছেন, তাঁরা গোষ্ঠী নির্বিশেষে 'অসুর' শব্দটি আর্যগণের শত্রু আনার্যগণের সঙ্গে সমার্থবোধক শব্দ হিসাবে ব্যবহার করেছেন। পরবর্তীকালেও 'অসুর' শব্দটি 'দানব', 'দৈত্য' ইত্যাদি নিন্দনীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছিল। ('অস' ধাতুর অর্থ ক্ষেপণ, অতএব সায়ন 'অসুর' শব্দের অর্থ 'অনিষ্টক্ষেপণশীল' করেছেন)। দেবাসুরের সমুদ্রমন্থন উপাখ্যানই তার স্বাক্ষর বহন করছে। আমি অন্যত্র বলেছি যে 'অসুর' শব্দটা আর্যভাষাভাষী এক নরগোষ্ঠীরই নাম। (আমার 'বাঙলার সামাজিক ইতিহাস', জিজ্ঞাসা, দেখুন)।

বস্তুত ঋগ্বেদে অসুরগণের যেমন নিন্দাবাদ ও কটাক্ষ প্রকাশ করা হয়েছে। তেমনই আবার

আর্যরা তাঁদের দেবতাগণের বিশেষণ হিসাবেও 'অসুর' ব্যবহার করেছেন। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে 'অসুর' শব্দ ১২ বার প্রয়োগ করা হয়েছে এবং কোনও এক স্থলেও দানবদের সম্বন্ধে এ শব্দের প্রয়োগ নেই। প্রথম মণ্ডলের যে যে স্থলে যে যে দেবতা সম্বন্ধে 'অসুর' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলি হচ্ছে—২৪ সূক্তের ১৪ ঋকে বরুণ সম্বন্ধে, ৩৫ সূক্তের ৭ ঋকে সূর্যরশ্মি সম্বন্ধে ৩৫ সূক্তের ১০ ঋকে সবিতা সম্বন্ধে, ৬৪ সূক্তের ২ ঋকে মরুদ্গণ সম্বন্ধে, ১০৮ সূক্তের ৬ ঋকে ঋত্বিকদের সম্বন্ধে, ১১০ সূক্তের ৩ ঋকে ত্বষ্টা সম্বন্ধে, ১২২ সূক্তের ১ ঋকে রুদ্র সম্বন্ধে, ১২৬ সূক্তের ২ ঋকে ভাবয়ব্য রাজা সম্বন্ধে, ১৫১ সূক্তের ৪ ঋকে মিত্র ও বরুণ সম্বন্ধে ও ১৭৪ সূক্তের ১ ঋকে ইন্দ্র সম্বন্ধে। দ্বিতীয় মণ্ডলে অসুর শব্দ দেবগণের সম্বন্ধে তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে, যথা ১ সূক্তের ৩ ঋকে রুদ্র সম্বন্ধে, ২৭ সূক্তের ১০ ঋকে বরুণ সম্বন্ধে ও ২৮ সূক্তের ৭ ঋকে বরুণ সম্বন্ধে। অনুরূপভাবে 'অসুর' শব্দ তৃতীয় মণ্ডলে ছয়বার ব্যবহৃত হয়েছে, দুই বার ব্যবহৃত হয়েছে চতুর্থ মণ্ডলে, ১১ বার ব্যবহৃত হয়েছে পঞ্চম মণ্ডলে, ১ বার ব্যবহৃত হয়েছে ষষ্ঠ মণ্ডলে, ৮ বার ব্যবহৃত হয়েছে সপ্তম মণ্ডলে, ৮ বার ব্যবহৃত হয়েছে অষ্টম মণ্ডলে, ৩ বার ব্যবহৃত হয়েছে নবম মণ্ডলে ও ১৯ বার ব্যবহৃত হয়েছে দশম মণ্ডলে। এখানে বলা প্রয়োজন যে, আর্যরা যেমন নিজেদের দেবতাদের 'দেব' বলত, অসুররা তেমনই নিজেদের দেবতাদের 'অসুর' বলত। উভয়েই এক সময় একই বাসস্থানে থাকতেন বলে, পরম্পরা অনুযায়ী বৈদিক আর্যসমাজেও 'অসুর' শব্দটি দেবগণের বিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত হত। অসুর ও বৈদিক আর্যগণ উভয়েই আর্য ভাষাভাষী হলেও তাদের মধ্যে একটা নৃতাত্ত্বিক প্রভেদ ছিল। অসুররা ছিল হ্রস্ব-কপাল বিশিষ্ট নরগোষ্ঠীর লোক, আর বৈদিক আর্যরা ছিল দীর্ঘ-কপাল বিশিষ্ট নরগোষ্ঠীর লোক। অসুরদের চেয়ে বৈদিক আর্যদের দেহদৈর্ঘ্য ছিল বেশি লম্বা। এছাড়া, তাদের নাকও ছিল বেশি উন্নত। এই নৃতাত্ত্বিক প্রভেদের বিশদ বিবরণ আমরা আগেই দিয়েছি।

পণি, দস্যু, দাস—এরা ছিল আনার্য ভাষাভাষী জাতি। পণিদের কাছেই আর্যরা দূতী সরমাকে পাঠিয়েছিলেন সন্ধান করতে তাদের গোধন চুরি করবার জন্য (১।৬।৫ ; ১।৩২।১৫ ; ১০।১০৮।১), আর দস্যু ও দাসদের আর্যরা ঘৃণা করেছে নগরবাসী, শিশ্নোপাসক ও যজ্ঞ-বিরোধী বলে। অথচ এদের মেয়েদেরই আর্যরা বিয়ে করেছিল, এবং তার ফলে যে সংস্কৃতির সংশ্লেষণ ঘটেছিল, তা-ই পরবর্তীকালে হিন্দুসভ্যতা নামে পরিচিত হয়েছিল। সুতরাং হিন্দুসভ্যতার যে একটা নৃতাত্ত্বিক ভিত্তি আছে তা বলা নিষ্প্রয়োজন।

আর্য ও অনার্য সভ্যতার সংশ্লেষণ ঘটেছিল সেখানে, যেটাকে আগে আমরা বলতাম 'মধ্যদেশ'। তার মানে কাশী, কোশল, বিদেহ ইত্যাদি দেশে। সেখানে আর্যদের আপোস করতে হয়েছিল অনার্যদের ভাষা, সভ্যতা ও লোকযাত্রার সঙ্গে। এটা বিবর্তনের ক্রমিক ধারাবাহিকতার ভিতর দিয়ে সম্পূর্ণতা লাভ করেছিল পৌরাণিক যুগে। এই সংশ্লেষণের পর আমরা ভারতীয় সভ্যতার সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ দেখি, যেটা বৈদিক সভ্যতা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। লোকে আর ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি বৈদিক দেবতার স্তুতি গান করে না। বৈদিক যজ্ঞও সম্পাদন করে না। নতুন দেবতামণ্ডলীর পত্তন ঘটায়। যজ্ঞের পরিবর্তে আসে পূজা ও উপাসনা। বৈদিক আত্মকেন্দ্রিক স্তুতিগানের পরিবর্তে আসে ভক্তি। এর ওপর প্রাগার্য তান্ত্রিক ধর্মেরও প্রভাব পড়ে।

আর্য চিন্তাধারার দ্বারা মণ্ডিত হয়ে, অনার্য দেবতাসমূহ পৌরাণিক যুগে সামনে এসে হাজির হয়। আর বৈদিক দেবতাসমূহ পশ্চাদ্ভূমিতে চলে যায়। বৈদিক ইন্দ্র তার শ্রেষ্ঠত্ব হারিয়ে মাত্র পূর্বদিকের একজন দিকপালে পর্যবসিত হয়। নতুন দেবতামণ্ডলীর মধ্যে আসে ব্রহ্মা

(যার উল্লেখ ঋগ্বেদে নেই), বিষ্ণু, শিব (যাকে আমরা সিন্ধুসভ্যতায় পাই), দুর্গা, কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী (ঋগ্বেদে নদী হিসাবে স্তুত হত), শীতলা, ষষ্ঠী, মনসা—আরও কত। অবতারবাদের সৃষ্টি হয়, তাতে বুদ্ধও স্থান পান। অবতারবাদের মধ্যেই আমরা পাই আর্য-অনার্য সংশ্লেষণের ইতিহাস। বৈদিক দেবতাগণের স্ত্রী ছিল বটে, কিন্তু দেবতামণ্ডলীর মধ্যে তাদের কোন আধিপত্য ছিল না। কিন্তু পৌরাণিক যুগে তারাই হল পুরুষ দেবতাগণের শক্তির উৎস। শিবজায়া দুর্গা এগিয়ে এলেন 'দেবী' হিসাবে দেবতামণ্ডলীতে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করতে। তাঁর আঁচল ধরে এলেন অনার্যসমাজের সেই সমস্ত দেবী, যাঁরা আগে লুকিয়ে ছিলেন গাছতলায়, ঝোপজঙ্গলে ও পর্বতকন্দরে। সেইসব দেবী সমপর্যায় লাভ করলেন 'দেবী'র সঙ্গে। বৈদিক যুগের আর্যরা যাদের ঘৃণার চক্ষে দেখতেন ও 'যজ্ঞনাশকারী' বলে যাদের সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম করতেন, শেষ পর্যন্ত সেই অনার্য নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীসমূহেরই জয় হল।

ইতিহাস ও মহাকাব্যের সীমানায়

রামায়ণ ও মহাভারত—এই দুই মহাকাব্যের ঐতিহাসিক মূল্য কতটা ? এই প্রশ্নের উত্তর দেবার পূর্বে আমরা প্রাচীন ভারতের ইতিহাস-সংক্রান্ত ঐতিহ্য সম্বন্ধে কিছু বলে নিতে চাই। আজকাল-কার দিনে আমরা যাকে বৈচারিক (ক্রিটিক্যাল) ইতিহাস বলি, এরূপ কিছু প্রাচীন ভারতে ছিল না। ছিল রাজারাজড়াদের কীর্তি ও অতীতের ঘটনাবলী সম্বন্ধে নানা বিশ্রুতি ও লোকপরম্পরাগত কাহিনী। এই সকল বিক্ষিপ্ত কাহিনীসমূহকে একত্রিত করে রচিত হয়েছিল গাথা (গীত), নারশংসি (প্রশস্তি), আখ্যান (নাটকীয় বৃত্তান্ত) এবং পুরাণ (প্রাচীন কাহিনী)। এই রচনাসমূহ গীত বা কীর্তিত হত। তার মানে এগুলো মুখে মুখেই এক পুরুষ থেকে আর এক পুরুষে হস্তান্তরিত হত। যারা এ কাজে রত ছিল, তাদের বলা হত সূত বা মাগধ। এরা প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রবক্তা ছিল। সামাজিক জীবনে এদের বেশ উচ্চ স্থান ছিল। এরা মহর্ষি ও রাজারাজড়াদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করত, ও তাদের সান্নিধ্যেই প্রাচীন কাহিনীসমূহ শ্রোতাদের শোনাত। প্রাচীন কাহিনীসমূহ সংরক্ষিত করবার এই রীতি প্রাক্-বৈদিক যুগ থেকেই প্রচলিত ছিল।

বুদ্ধের (খ্রিস্টপূর্ব ৫৬৩-৪৮৩) আবির্ভাবের পর এ সকল আখ্যান ও উপকথাসমূহ 'জাতক' কাহিনীর রূপ ধারণ করে। জাতককাহিনীসমূহ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসম্মেলনে বিবৃত হয়েছিল। প্রথম বৌদ্ধ মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে, দ্বিতীয় মহাসম্মেলন খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে ও তৃতীয় মহাসম্মেলন সম্রাট আশোকের (২৬৯-২৩২খ্রিঃ পূঃ) রাজত্বকালে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে। সুতরাং জাতককাহিনীসমূহ খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের পূর্বেই রচিত হয়ে গিয়েছিল। এছাড়া, ভারহুত ও সাঞ্চীতে (খ্রিস্টপূর্ব ২০০) জাতকের কেন কোন কাহিনী খোদিত হয়েছিল।

প্রাচীন ইতিহাস সংরক্ষণের এই রীতি খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্ত সম্রাটগণের অভ্যুত্থানের পর এই রীতির একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। সূত ও মাগধরা সমাজে অবনমিত হয়। তাদের স্থান গ্রহণ করেন ব্রাহ্মণ-পুরোহিতরা। তাঁরা রচনা করতে থাকেন পুরাণসমূহ। ইতিহাস এখন 'শোনা কথা' থেকে লিখিত রূপ ধারণ করে। পুরাণ মানেই হচ্ছে পুরনো যুগের কথা। ('পুরাভবম্' ইতি পুরাণম্ এবং 'ইতিহ-আস' হল ইতিহাস)। অবশ্য রাজারাজড়ার কথা ছাড়া, পুরাণে আরও অনেক কিছু বিষয় আছে।

অনেকগুলি পুরাণ লেখা হয়েছিল। তবে তাদের মধ্যে ১৮ খানাকে মহাপুরাণ বলা হয়। বাকিগুলিকে বলা হয় উপপুরাণ। ১৮ খানা মহাপুরাণ হচ্ছে: (১) ব্রহ্ম, (২) পদ্ম, (৩) বিষ্ণু, (৪) শিব, (৫) ভাগবত, (৬) নারদ, (৭) মার্কণ্ডেয়, (৮) অগ্নি, (৯) ভবিষ্য, (১০) ব্রহ্মবৈবর্ত, (১১) লিঙ্গ, (১২) বরাহ, (১৩) স্কন্দ, (১৪) বামন, (১৫) কূর্ম, (১৬) মৎস্য, (১৭) গরুড়, (১৮) ব্রহ্মাণ্ড। পুরাণগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। এগুলি হয় বৈষ্ণব, আর তা নয় তো শৈব কিংবা শাক্ত। অমরকোষে পুরাণসমূহের পাঁচটি লক্ষণ নির্দিষ্ট হয়েছে—(১) সর্গ (সৃষ্টি), (২) প্রতিসর্গ (প্রলয়ের পর নবসৃষ্টি), (৩) বংশ (দেবতা ও মহর্ষিগণের বংশতালিকা), (৪) মন্বন্তর (১৪ জন মনুর শাসন বিবরণ) ও (৫) বংশানুচরিত (রাজাগণের বংশাবলী)। কোন কোন পুরাণের আরও বেশি লক্ষণ আছে।

স্কন্দপুরাণে এত প্রকীর্ণ বিষয়ের সমাবেশ আছে যে এটিকে 'বিশ্বকোষ' বলা যায়। এতে ৮১,৫০০ শ্লোক আছে। তার মানে এটি মহাভারতের চেয়েও বড়। অমরকোষ বর্ণিত পঞ্চলক্ষণযুক্ত প্রামাণিক পুরাণ হচ্ছে বিষ্ণুপুরাণ।

আমার শিক্ষাগুরু ডঃ দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকার বলেছেন যে, পুরাণসমূহের মধ্যেই প্রাচীন ভারতের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। ঐতিহাসিক ডঃ ভিনসেন্ট স্মিথ দেখিয়েছেন যে, মৎস্যপুরাণে অন্ধ্র-রাজগণের বংশতালিকা ও তাঁদের রাজত্বকাল সঠিকভাবে দেওয়া হয়েছে। এফ. ই. পার্জিটার বেদ অপেক্ষা পুরাণের ঐতিহাসিক মূল্য বেশি বলেছেন, এবং এল. ডি. বার্নেট ওই মতই সমর্থন করেছেন। শ্রীমতী রমিলা থাপারও ঐতিহাসিক তথ্যের উৎস হিসাবে পুরাণগুলির বিশেষ গুরুত্ব আছে বলে মত প্রকাশ করেছেন।

পুরাণগুলির কথায় আমরা আবার ফিরে আসব। ইতিমধ্যে আমরা বলে নিতে চাই যে, পুরাণগুলি রচিত হবার পরই ইতিহাস রচনার প্রতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ আগ্রহী হন। যদিও প্রথম প্রথম এগুলি নাটকের রূপ ধারণ করেছিল, যেমন কালিদাস রাজা দুষ্মন্তের কাহিনী 'শকুন্তলা' নাটকে ও পুষ্যমিত্র শুঙ্গের কাহিনী 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকে চিত্রিত করেন। ওই যুগেই রচিত হয়েছিল চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সম্বন্ধে 'মুদ্রারাক্ষস' নাটক। নিছক ঐতিহাসিক তথ্য পরি-বেশন করলেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সভাকবি হরিষেণ তাঁর 'প্রশস্তি'তে। তারপর হর্ষবর্ধনের সময় (৬০৬-৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে) বাণভট্ট লিখলেন 'হর্ষচরিত', গৌড়াধিপতি রামপালের সময় সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁর 'রামচরিত', বিলহন 'বিক্রমাঙ্কদেবচরিত', 'কুমারপালচরিত', ও জয়ানক 'পৃথ্বীরাজবিজয়',। দ্বাদশ শতাব্দীতে বেশ আনুষ্ঠানিকভাবে একখানা ইতিহাস লিখলেন কলহন। তাঁর 'রাজতরঙ্গিণী'তে তিনি বিবৃত করলেন সুপ্রাচীনকাল থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত কাশ্মীরের ইতিহাস। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে প্রাচীনকালে সূতগণ কর্তৃক কীর্তিত আখ্যায়িকাসমূহ থেকে শুরু করে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত নানারকম সাহিত্যিক রূপভঙ্গি নিয়ে আমাদের দেশে ইতিহাসমূলক রচনার অস্তিত্ব ছিল। প্রাচীন ভারতবাসীদের যে একেবারে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না, সেকথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। তবে প্রাচীন ভারতে ইতিহাসমূলক আখ্যায়িকাসমূহ যখন সূতগণ কর্তৃক কীর্তিত হত, তখন শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের জন্য তাঁরা তার মধ্যে এত অতিরঞ্জিত, অলৌকিক ও বিস্তর ঘটনার সমাবেশ করতেন যে আখ্যায়িকাসমূহের ঐতিহাসিক কঙ্কালের প্রতিও লোকের মনে সন্দেহ জাগে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'রামায়ণ-মহাভারতকে কেবলমাত্র মহাকাব্য বলিলে চলিবে না, তাহা ইতিহাসও বটে।'

রামায়ণ ও মহাভারত—এই দুখানা মহাকাব্য দুই রাজবংশের ইতিহাস। এই দুই রাজবংশ হচ্ছে সূর্যবংশ ও চন্দ্রবংশ। পুরাণসমূহে যে বংশতালিকা দেওয়া আছে, তা থেকে আমরা জানতে পারি যে, জগতে যে মহাপ্লাবন ঘটেছিল তা থেকে রক্ষা পেয়েছিল একমাত্র সূর্যপুত্র বৈবস্বত মনু। মনু কর্তৃক মানুষ সৃষ্ট হয়েছিল বলে মানুষের নাম মানব। বৈবস্বত মনুর পুত্র ইক্ষবাকুই সূর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর দুই পুত্র বিকুক্ষি ও নিমি যথাক্রমে অযোধ্যায় ও বিদেহে রাজত্ব করতেন। বিকুক্ষির বংশে দশরথপুত্র রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। আর নিমির বংশে জন্মগ্রহণ করেন জনক, যাঁর কন্যা সীতাকে রামচন্দ্র বিবাহ করেছিলেন। ইক্ষবাকুর অপর এক ছেলে নাভানেদিষ্ট্য বৈশালীতে রাজত্ব করতেন। তিনিই বৈশালী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইক্ষবাকুর আর এক পুত্র দণ্ডক দণ্ডকারণ্যে রাজত্ব করতেন। মনুর কন্যা ইলার পুত্র পুরুরবা চন্দ্রবংশের প্রতিষ্ঠাতা। পুরুরবার পৌত্র ক্ষত্রবৃদ্ধ কাশী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। পুরুরবার অপর পৌত্র নহুষের পৌত্রেরা যথাক্রমে হৈহয়, যাদব, তুর্বসু, দ্রুহ্যু, আনব ও পৌরব বংশ সকল স্থাপন করেন।

বৌদ্ধসাহিত্যে ইক্ষ্বাকুবংশকে পালিভাষায় 'ওক্কক' বংশ বলা হয়েছে (সুত্তনিপাত ৪২০)। আমরা পূর্ব অনুচ্ছেদে দেখেছি যে বৈবস্বত মনুর এক পুত্র ইক্ষ্বাকু বংশের প্রতিষ্ঠাতা ও অপর এক পুত্র বৈশালীর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। বৌদ্ধসাহিত্য অনুযায়ী শাক্যবংশ (যে বংশে বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেছিলেন) হচ্ছে ইক্ষ্বাকু বংশেরই এক শাখা। বৌদ্ধসাহিত্যের আর এক জায়গায় আমরা পড়ি যে, রাজা ওক্ককের (ইক্ষ্বাকুর) প্রধানা মহিষীর গর্ভে পাঁচ ছেলে ও চার মেয়ে জন্মগ্রহণ করে। ওই প্রধানা মহিষীর মৃত্যুর পরে রাজা এক যুবতীকে বিবাহ করেন। এই রানীর যখন এক পুত্র হয়, তখন তিনি রাজাকে বলেন যে তাঁর ছেলেকেই রাজা করতে হবে। রাজা তাঁর প্রথম মহিষীর পাঁচ পুত্র ও চার মেয়েকে হিমালয়ের পাদদেশে নির্বাসিত করেন। সেখানে কপিল মুনির সঙ্গে তাদের দেখা হয়। কপিল মুনি তাদের সেখানে একটি নগর স্থাপন করে বসবাস করতে বলেন। এই নগরের নামই কপিলাবস্তু হয়। ভ্রাতাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ অকৃতদার রইল। আর বাকি চার ভাই চার বোনকে বিবাহ করল। এই কাহিনীটা 'মহাবস্তু'তে একটু অন্যভাবে দেওয়া আছে। সেখানে রাজার দ্বিতীয়া স্ত্রীকে রক্ষিতা বলা হয়েছে।

বৌদ্ধসাহিত্যের আর এক কাহিনী (অম্বতথ সুত্ত ১।১৬; কুনাল জাতক ৫৩৬) অনুযায়ী শাক্যরা ছিল পাঁচ বোন ও চার ভাই। এই কাহিনী অনুযায়ী জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে তারা মাতৃরূপে বরণ করে, আর চার ভাই চার বোনকে বিবাহ করে। জ্যেষ্ঠা পরে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তা হয় এবং তাকে বনমধ্যে এক গর্তের মধ্যে ফেলে দিয়ে আসা হয়। একদিন সে ব্যাঘ্র কর্তৃক আক্রান্ত হলে বারাণসীর রাজা রাম এসে তাকে উদ্ধার করে। রামও কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হয়ে বনে নির্বাসিত হয়েছিল, কিন্তু পরে সে নিজেকে নিরাময় করে। সে নিরাময় করবার উপায় জানত এবং তা দ্বারা ওই মেয়েটিকে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত করে। তারপর তাদের দুজনের মধ্যে বিবাহ হয়, এবং তাদের যে সন্তান হয়, তাদের কপিলাবস্তু নগরে তাদের মাতুলকন্যাদের বিবাহ করবার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এদের গর্ভে যে সন্তান হয়, তারাই 'কোলিয়' ট্রাইব নামে পরিচিত হয়। কোলিয়রা শাক্যদেরই সংলগ্ন ভূখণ্ডে রাজ্য স্থাপন করে। এই উভয় রাজ্যের সীমানা দিয়ে রোহিণী নদী প্রবাহিতা ছিল। ভূমিকর্ষণের জন্য রোহিণী থেকে জলসেচনের ব্যাপার নিয়ে শাক্য ও কোলিয়দের মধ্যে বিবাদ বাধে।

লিচ্ছবীরাও বারাণসীর রাজবংশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বৌদ্ধসাহিত্যের (বুদ্ধঘোষের 'পরমথ-জ্যোতিকা', 'ক্ষুদ্দকপথ পৃ. ১৫৮-৬০) এক কাহিনী অনুযায়ী বারাণসীর রাজার প্রধানা মহিষী একখণ্ড মাংসপিণ্ড প্রসব করেন। তিনি ওই মাংসপিণ্ডটিকে একটি পেটিকায় করে নদীতে ভাসিয়ে দেন। ওটা যখন ভেসে যাচ্ছিল, তখন একজন মুনি ওটাকে তুলে সংরক্ষণ করেন। পরে ওই মাংসপিণ্ড থেকে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে উৎপন্ন হয়। তাদের নাম লিচ্ছবী দেওয়া হয়। এদের দুজনের মধ্যে বিবাহ হয়, এবং এরা বৈশালী রাজ্য স্থাপন করে। লিচ্ছবীরা পরে এমন শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে গঙ্গা উপত্যকার আধিপত্য নিয়ে মগধের রাজার সঙ্গে তাদের বিরোধ হয়। যদিও লিচ্ছবীরা পরাহত হয়েছিল তা হলেও পরবর্তীকালে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবীবংশীয়া এক মেয়েকে বিবাহ করেছিলেন।

বৌদ্ধসাহিত্যের এই সকল কাহিনী থেকে আমরা জানতে পারি যে হিমালয়ের পাদদেশের রাজ্যসমূহ ইক্ষ্বাকুবংশীয় ও তাদের মধ্যে সহোদরা ও মাতুলকন্যা বিবাহ প্রচলিত ছিল। হিন্দু ধর্মশাস্ত্রসমূহে সগোত্র ও সপিণ্ড বিবাহ নিষিদ্ধ। এখানেই হিন্দুসাহিত্যের সঙ্গে বৌদ্ধসাহিত্যের বিরোধ।

পুরাণ ও বৌদ্ধসাহিত্য থেকে এত উদ্ধৃতি দেবার কারণ হচ্ছে, আমি দেখাতে চাই যে ইক্ষ্বাকু বংশ কোন অলীক রাজবংশ নয়। এটা হচ্ছে একটা ঐতিহাসিক রাজবংশ, এবং

রামায়ণ সেই রাজবংশেরই ইতিহাস। বংশাবলী হচ্ছে ইতিহাসের কঙ্কাল, এবং সেই কঙ্কালকেই পল্লবিত করে ইতিহাসের রূপ দেওয়া হয়। বাল্মীকি সেই ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে যদি অতিরঞ্জিত, অলৌকিক ও অবাস্তব ঘটনার আশ্রয় নিয়ে থাকেন, তাহলে তাতে ইতিহাসের মূল কাঠামোটা একেবারে নস্যাৎ হয়ে যাবে না। পুরাণসমূহ থেকে আমরা দেখেছি যে ইক্ষ্বাকুবংশের আধিপত্য কোশল, কাশী, বিদেহ, বৈশালী ও দণ্ডকারণ্য পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এইটাই রামায়ণে মূল আখ্যায়িকার ভৌগোলিক পরিসীমা। সমস্ত রামকথাটাই আমার মনে হয় ইক্ষ্বাকু বংশের মাইগ্রেশন বা পরিযানের ইতিহাস। বৈশালী বা হিমালয়ের পাদদেশে সে মাইগ্রেশন বা পরিযানের ইতিহাস সমর্থিত হচ্ছে বৌদ্ধসাহিত্য-সমূহের কাহিনী দ্বারা। আর পুরাণ ও রামায়ণ দ্বারা সমর্থিত হচ্ছে বিদেহ ও দণ্ডকারণ্য পর্যন্ত মাইগ্রেশনের ইতিহাস।

রামায়ণ যে ইক্ষ্বাকু বংশের ইতিহাস সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। রামায়ণ যে হোমারের 'ইলিয়াড'-এর অনুকরণে রচিত হয়েছিল, এ মতবাদ একেবারেরই শিশুসুলভ। রামায়ণের ওপর 'ইলিয়াড' কাব্যের প্রভাব সম্বন্ধে প্রথম মতবাদ প্রকাশ করেন গত শতাব্দীতে বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যাবিদ ভেবার। কিন্তু তাঁর ওই মতবাদ একেবারে নস্যাৎ করে দেন সমসাময়িক ওঁরই সমকক্ষ আর একজন প্রাচ্যবিদ্যাবিদ ইয়াকোবি। পরবর্তীকালে ভিনটারনিৎস তাঁর 'ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস'-এ ইয়াকোবিকেই সমর্থন করেছেন। তিনি বলেছেন—'সমগ্র রামায়ণ কাব্যটিতে গ্রীকপ্রভাবের লেশমাত্র চিহ্ন নেই। গ্রীক বা যবনদের সঙ্গে পরিচয়জ্ঞাপক কোনও উল্লেখই নেই। তাছাড়া, রাম ও সীতার সঙ্গে হেলেন ও ইউলিসিস সম্পর্কিত কাহিনী দুটির মধ্যে সাদৃশ্য খুবই পরোক্ষ।' বর্তমানকালের একজন বড় পণ্ডিত ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রীও খুব দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেছেন—'রামায়ণের ওপর কোন গ্রীকপ্রভাব নেই। মূল রামায়ণ গ্রীকগণের সহিত পরিচিতির কোন প্রমাণই বহন করে না।' তাছাড়া, বাল্মীকি বর্তমান উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চলের কবি ছিলেন। এই অঞ্চলের সঙ্গে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর পূর্বে গ্রীকদের কোন পরিচয় ঘটেনি। ওই শতাব্দীর প্রথম দিকে দিমিত্রাস ও শেষের দিকে মিলিন্দ-এর আক্রমণের ফলে বিহার ও উত্তরপ্রদেশের কিছু কিছু অংশ গ্রীকদের অধীনে যায়। বাল্মীকির রামায়ণ তার আগেই রচিত হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং বাল্মীকির রামায়ণের ওপর গ্রীকপ্রভাবের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। অবশ্য এর বিপক্ষে রামায়ণের একটা শ্লোক উদ্ধৃত করা যেতে পারে। সেটা হচ্ছে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে মনুর উল্লেখ। সেখানে বলা হয়েছে—'শ্রুয়তে মনুনা শ্লোকৌ চারিত্র বৎসলৌ। গৃহীতৌ ধর্মকুশলৈস্তথা অচ্চরিত্রংময়া।' (৫।১০)। এখন মনু তাঁর মানবধর্ম শাস্ত্রের দশম অধ্যায়ে 'জবন' শব্দের ব্যবহার করেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন— 'পৌণ্ড্রাকা-শ্চৌড্র-দ্রাবিড়াঃ কাম্বোজ জবনাঃ শকাঃ।' (১০।৪৪) কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে, মনু একজন অতি প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রকার। বর্তমান 'মানবধর্মশাস্ত্র' রচিত হবার পূর্বে, বহু প্রাচীনকাল থেকে মনুর বচনসমূহ প্রচলিত ছিল। বাল্মীকি এইরূপ কোন প্রাচীন বচনকে লক্ষ্য করেই উক্ত শ্লোকে মনুর উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা বাল্মীকির রামায়ণ বর্তমানে প্রচলিত 'মনুসংহিতা'র পরে রচিত হয়েছিল তা প্রমাণ হয় না।

একটা কথা এখানে বলে নিতে চাই। রামায়ণ ও মহাভারতের রচনাকাল ও কাহিনীকাল এক নয়। উভয়ের মধ্যে বহু শতকের ব্যবধান আছে। অনুরূপভাবে জাতককাহিনীসমূহের রচনাকাল ও কাহিনীকালের মধ্যেও দীর্ঘকালের ব্যবধান আছে। মনে হয় বাল্মীকির রামায়ণ ও জাতককাহিনীসমূহ রচিত হবার বহু পূর্ব থেকে ভারতের বিভিন্ন রাজবংশ সম্বন্ধে সূতকীর্তিত বহু আখ্যায়িকা প্রচলিত ছিল, এবং সেই সাধারণ আখ্যায়িকার ভাণ্ডার থেকেই বাল্মীকি ও জাতককাহিনীসমূহের রচয়িতারা তাঁদের উপাদানসমূহ সংগ্রহ করেছিলেন।

এখন দেখা যাক দশরথ জাতকের সঙ্গে রামায়ণের কতটা মিল আছে। দশরথ জাতকের কাহিনী অনুযায়ী পূর্বকালে বারাণসীর রাজা দশরথের প্রধানা মহিষীর গর্ভে তিন সন্তান জন্মায়—রামপণ্ডিত, লক্ষ্মণকুমার ও সীতাদেবী। ওই মহিষীর মৃত্যুর পর দশরথ অপর একজনকে প্রধানা মহিষী করেন। তার গর্ভে ভরত নামে এক সন্তানের জন্ম হয়। দশরথ একবার ভরতের মাকে একটা বর দিয়েছিলেন। সেই বরের জোরে ভরতের মা ভরতকে রাজা করতে হবে বলে দাবি করেন। তখন দশরথ রাম-লক্ষ্মণকে দূরান্তরে গিয়ে থাকতে বলেন, এবং বলেন যে বারো বছর পরে তাঁর মৃত্যু ঘটলে রাম যেন ফিরে এসে রাজ্যভার গ্রহণ করে। রাজার এই কথায় রাম ও লক্ষ্মণ সীতাকে নিয়ে হিমালয় প্রদেশে চলে যান। এর নয় বৎসর পরে দশরথের মৃত্যু ঘটে। তখন ভরত রামকে ফিরিয়ে আনতে যায়। কিন্তু বারো বৎসর পূর্ণ হবার আগে রাম ফিরতে চাইলেন না। বারো বৎসর উত্তীর্ণ হলে রাম বারাণসীতে ফিরে এসে রাজা হন ও সীতাকে বিবাহ করে তাঁর মহিষী করেন।

দশরথ জাতকে রামের দণ্ডকারণ্যে যাওয়া, সীতাহরণ, রাম-রাবণের যুদ্ধ ইত্যাদি কিছুই নেই। তাছাড়া, দশরথ জাতকের রাম হিমালয় প্রদেশে গিয়েছিল, আর বাল্মীকির রামায়ণের রাম দণ্ডকারণ্যে গিয়েছিল। মনে হয় রাম-সীতা সম্পর্কে একটা আখ্যায়িকা অতি প্রচীনকাল থেকে এদেশের গণসমাজে প্রচলিত ছিল, এবং বাল্মীকি ও জাতককাহিনীর রচয়িতা উভয়েই সেই আখ্যায়িকার ওপর নির্ভর করেন ও বাল্মীকি তাঁর কবিত্ব শক্তিসম্পন্ন কল্পনা দ্বারা তাকে পল্লবিত করেছিলেন। একজন আর একজনকে অনুসরণ করেননি।

আগেই বলেছি যে বাল্মীকি হোমারের ইলিয়াড দ্বারাও প্রভাবান্বিত হননি। যে কারণে এই প্রভাবের কথা বলা হয়েছে, সেটা হচ্ছে সীতাহরণ ও রাম-রাবণের যুদ্ধ। এখানে মনে রাখা দরকার যে, রামায়ণ ও মহাভারত, এই দুখানি মহাকাব্য বিশ্বের দুটি চিরন্তন সত্যকে আশ্রয় করে লিখিত। একটা হচ্ছে নারী ও আর একটা হচ্ছে ভূমি। রাম-রাবণের যুদ্ধ হয়েছিল নারীহরণ নিয়ে, আর মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল সূচ্যগ্র ভূমির জন্য। নারীহরণ ও তার জন্য যুদ্ধ, এই বিষয়বস্তুর জন্য বাল্মীকিকে গ্রীককবি হোমারের কাছে যাবার কোন দরকার ছিল না। বাল্মীকির হাতের কাছেই তার উপাদান ছিল। বালী কর্তৃক সুগ্রীবের স্ত্রী রুমাহরণ ও তজ্জন্য যুদ্ধ—এ তো সীতাহরণ ও রাম-রাবণের যুদ্ধেরই একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ।

মনে হয় সীতাহরণ, ও রাম-রাবণের যুদ্ধ, এ সমস্ত ব্যাপারটাই বাল্মীকির কল্পনাপ্রসূত, কেননা, সিংহল দেশের সাহিত্যে এরূপ কোন যুদ্ধের উল্লেখ নেই। সিংহল দেশের সাহিত্যে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, বাঙলা দেশের রাজপুত্র বিজয়সিংহই প্রথম রাক্ষসদের পরাহত করে সিংহলে রাজ্যস্থাপন করেন। আরও, বাল্মীকির কাহিনী কল্পনাপ্রসূত বলবার কারণ হচ্ছে প্রথমত, উত্তরাপথ সম্বন্ধে তিনি যেরূপ বিশদ ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন, দক্ষিণাপথ সম্বন্ধে সেরূপ দিতে পারেননি। বস্তুত দক্ষিণাপথ সম্বন্ধে তাঁর সঠিক ভৌগোলিক জ্ঞানের অভাব চাপা দেবার জন্যই, তিনি দণ্ডকারণ্য থেকে রাবণ কর্তৃক সীতাকে লঙ্কায় নিয়ে যাওয়া আকাশপথে ঘটিয়েছেন। আবার লঙ্কা থেকে রামের সীতাকে নিয়ে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনটাও পুষ্পক রথে আকাশপথে ঘটিয়েছেন। লঙ্কা সম্বন্ধে বাল্মীকি যা কিছু জ্ঞান দেখিয়েছেন তা উত্তর ভারতের পূর্বাঞ্চলের বণিকদের কাছে শোনা কথা ; দ্বিতীয়ত, বাল্মীকি লিখেছেন ভারতের সঙ্গে লঙ্কার মধ্যে সমুদ্রপথে ব্যবধান হচ্ছে শত যোজন। এক যোজনের পরিমাণ হচ্ছে চার ক্রোশ বা আট মাইল। সুতরাং বাল্মীকির ধারণা অনুযায়ী ভারত ও লঙ্কার মধ্যে সমুদ্রের ব্যবধান হচ্ছে ৪০০ ক্রোশ বা ৮০০ মাইল। বাস্তবে কিন্তু ভারত ও লঙ্কার মধ্যে সমুদ্রের নিকটতম ব্যবধান হচ্ছে মাত্র ২১ মাইল বা সাড়ে দশ ক্রোশ।

বাল্মীকির প্রকৃত ভৌগোলিক জ্ঞান অযোধ্যা থেকে দণ্ডাকারণ্য পর্যন্তই ছিল। এটাই ছিল ইক্ষ্বাকুবংশের আধিপত্যের অঞ্চল। অযোধ্যা থেকে দণ্ডকারণ্য পর্যন্ত বাল্মীকি যে রকম ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন (যেমন কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে পম্পা সরোবরের বর্ণনা) সে জ্ঞান তাঁর দক্ষিণ ভারত সম্বন্ধে ছিলই না। সেজন্য মনে হয় দশরথ জাতক মূল আখ্যায়িকাকে যথাযথভাবে অনুসরণ করেছিল, আর বাল্মীকি তাঁর কাহিনীকে কল্পনামণ্ডিত করেছিলেন।

বালী ও সুগ্রীবের মধ্যে যুদ্ধটা সূর্যবংশের সঙ্গে চন্দ্রবংশের সংঘর্ষ কিনা তা সন্দেহ করবার কারণ আছে। দণ্ডকারণ্য রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা দণ্ডক ইক্ষ্বাকুরই এক সন্তান। সেজন্যই বোধ হয় কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে সুগ্রীবকে সূর্যপুত্র বলা হয়েছে। আর বালীকে বলা হয়েছে ইন্দ্রের সন্তান। চন্দ্রবংশের সঙ্গে ইন্দ্রের সম্বন্ধ অর্জুনের জন্ম থেকেই বুঝতে পারা যায়। নিম্নলিখিত সমীকরণটা এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করতে পারে—

অর্জুন=কুন্তী+ইন্দ্র। বালী=ঋক্ষরজা+ইন্দ্র

পৌরাণিক বংশাবলী থেকে আমরা একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। যেহেতু কোশল ও বিদেহ, এই দুই রাজ্যের রাজারা একই বংশোদ্ভূত, সেইহেতু দশরথ ও জনক পরস্পর জ্ঞাতিভাই। তাহলে, রাম ও সীতার সম্পর্কটা হল ভাই-বোনের সম্পর্ক। যদিও দশরথ জাতকে সীতাকে সহোদরা বলা হয়েছে, বাল্মীকির রামায়ণে কিন্তু সীতার জন্ম বৃত্তান্তটা তার প্রকৃত জন্মকে গোপন করেছে। সীতা কি সত্য-সত্যই রাজা দশরথের মেয়ে এবং পালন করবার জন্য জনকের কাছে তাকে রাখা হয়েছিল, যেমন দশরথ-কন্যা শান্তাকে পালনের জন্য অঙ্গরাজের কাছে রাখা হয়েছিল ?

কৌশল ও বিদেহ উত্তর ভারতের পূর্বাঞ্চলের অংশবিশেষ ছিল। এই অঞ্চলে প্রাচীনকালে ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহ যে প্রচলিত ছিল, তার প্রমাণ বৌদ্ধসাহিত্যে ভূরি ভূরি আছে (আগে দেখুন)। এই অঞ্চলে বোধ হয় সহোদরার অভাবে অন্য বোনকেও বিবাহ করা যেত। যেমন নন্দীয় বিবাহ করেছিল তার মাতুলকন্যা রেবতীকে। অর্ধমাগধী ভাষায় রচিত জৈনসাহিত্যেও এরূপ বিবাহের উল্লেখ আছে। (আমার 'ভারতের বিবাহের ইতিহাস' গ্রন্থ দেখুন)। সুতরাং দশরথ জাতকে যদি রাম-সীতা—এই ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহের উল্লেখ থাকে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আমি আমার 'ভারতের বিবাহের ইতিহাস' গ্রন্থে দেখিয়েছি যে, মাত্র রামই নিজ ভগিনীকে বিবাহ করেননি, রামের পিতা দশরথও তাই করেছিলেন। দশরথের সঙ্গে কৌশল্যার বিবাহই তার দৃষ্টান্ত। দশরথ কোশল রাজবংশের নৃপতি ছিলেন। কৌশল্যাও যে সেই বংশেরই মেয়ে ছিলেন, তা তাঁর নাম থেকেই প্রকাশ পাচ্ছে। (তুলনা করুন গান্ধারী, মাদ্রী, বৈদেহী, কুন্তী, দ্রৌপদী ইত্যাদি)। সুতরাং নিজ বংশেই যে রাজা দশরথ বিয়ে করেছিলেন, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আজকালকার দৃষ্টিভঙ্গিতে ভাই-বোনদের মধ্যে বিবাহ অজাচার বলে গণ্য হবে। কিন্তু কোনটা অজাচার, আর কোনটা অজাচার নয়, তার বিচার করবে যে সমাজের মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সেই সমাজ—অপরে নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে বর্তমানে ভারতে এমন সব জাতি আছে যাদের মধ্যে বাধ্যতামূলকভাবে বিমাতাকে ও নিজ শাশুড়িকে বিবাহ করতে হয় (আমার 'ভারতের বিবাহের ইতিহাস' দেখুন)। এ সব সমাজে এরূপ বিবাহ অজাচার নয়, কিন্তু আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে অজাচার।

আমি আগেই বলেছি যে রামায়ণের কাহিনী ও রচনাকালের মধ্যে বহু বৎসরের ব্যবধান ছিল। এখন স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে যে এই কাহিনীর কালটা কত প্রাচীন ? এ প্রশ্নের উত্তর দেবার পূর্বে আমরা প্রথমে মহাভারতের কাহিনীকাল নির্দেশ করতে চাই, কেননা মহাভারতের কাহিনীকাল সম্বন্ধে আমাদের নির্ভরযোগ্য প্রমাণ আছে। বরাহমিহির আমাদের

দেশের একজন বড় জ্যোতির্বিদ ও জ্যোতিষী ছিলেন। সুতরাং কালনির্ণয়ে আমরা তাঁর গণনা নির্ভুল বলে ধরে নিতে পারি। বরাহমিহিরের 'বৃহৎসংহিতা'র গণনানুসারে ৬৫৩ কল্যাব্দে পাণ্ডু-পুত্র যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক হয়েছিল। বর্তমানে (১৩৮৭ বঙ্গাব্দে) ৫০৮১ কল্যাব্দ চলছে। সুতরাং সেই হিসাব অনুযায়ী যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকের সময় ছিল ৪৪২৭ বৎসর পূর্বে বা খ্রিস্টপূর্ব ২৪৪৮ অব্দে। এ তারিখটা আর্যভট্টও সমর্থন করেছেন। এটা তাম্রাশ্মযুগের সমকালীন।

ভারতীয় ট্রাডিশন অনুযায়ী রামকথা ভারতকথা অপেক্ষা পুরানো। সুতরাং ভারতকথা যদি তাম্রাশ্মযুগের হয়, তাহলে রামকথা তার আগেকার যুগের বা নবপলীয় যুগের। দু'টি মহাকাব্যই রচিত হয়েছিল কাহিনীকালের অনেক পরে। সেজন্য রচয়িতারা তাঁদের নিজেদের সমকালীন অবস্থা ও সভ্যতার দ্বারা এ দুটিকে মণ্ডিত করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও অতীতের কাহিনীকালের কিছু কিছু নিদর্শন এর মধ্যে ঢুকে পড়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, বনবাসে যাবার পূর্বে রামের বল্কল ও সীতার চীর পরিধান করা। রামের বল্কল ও সীতার চীর পরিধান করা তো কৈকেয়ীর বর প্রার্থনার শর্তের মধ্যে ছিল না; তবে কেন রাজবংশের বধূ বসন পরিহার করে পর্ণপত্রদ্বারা নিজের লজ্জা নিবারণ করলেন? (এ দুটি যে নবপলীয় যুগের বসন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই)। অথচ রামায়ণের পরবর্তী কাণ্ডসমূহ থেকে আমরা জানতে পারি যে, সীতার রাজকীয় বসন ও অলঙ্কার এ দুইই তাঁর অঙ্গে ছিল। (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে সীতার অলঙ্কারসমূহ সনাক্ত করবার জন্য লক্ষ্মণের প্রতি রামের আদেশ দেখুন)। এই অসংগতির একমাত্র কারণ হচ্ছে রামকথা এমন এক যুগের ব্যাপার ছিল, যে যুগে বল্কল ও চীর পরিধান রীতি ছিল। ভাল করে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে রামায়ণে বর্ণিত রণনীতি ও শিল্পিক টেকনোলজি নবপলীয় যুগের। অনুরূপভাবে মহাভারতে আমরা দেখি যে রাজারাজড়ার ছেলেদের বসবাসের জন্য জতুমিশ্রিত এক পর্ণকুটির তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল। এ সকল অসংগতি মূল কাহিনী থেকেই নেওয়া হয়েছিল।

বাল্মীকি রাবণ ও রাক্ষসগণের চরিত্র অতি কদর্যভাবে অঙ্কিত করেছেন। কিষ্কিন্ধ্যার অনার্য অধিবাসীদের তিনি মানুষ বলতেও কুণ্ঠাবোধ করেছেন। তাদের বানর বলে অভিহিত করেছেন। এ সব থেকে অনার্যদের প্রতি বাল্মীকির বিদ্বেষই প্রকাশ পায়। কিন্তু মহাভারতে আমরা অনার্যদের প্রতি এরূপ কোন বিদ্বেষ লক্ষ্য করি না। মহাভারত রচয়িতা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস নিজেই তো এক অনার্য রমণীর অবৈধ সন্তান ছিলেন। মহাভারতের কাহিনীর মধ্যে আর্য ও অনার্যদের মধ্যে যে একটা সংশ্লেষণের চেষ্টার চিত্র রয়েছে, তা পরস্পর বিবাহের আদান-প্রদান থেকে বুঝতে পারা যায়। ব্রাহ্মণ কর্তৃক নিষাদ কন্যাকে বিবাহ মহাভারতের একাধিক স্থানে আছে। মহাভারতের এক জায়গায় উল্লিখিত হয়েছে যে জনৈক ব্রাহ্মণ 'পক্ষী' জাতির এক মেয়েকে বিবাহ করেছিলেন। এখানে 'পক্ষী' জাতি বলতে পক্ষী টটেমবিশিষ্ট কোন অনার্য জাতিকে বুঝাচ্ছে। মহাভারতীয় যুগে রাজারাজড়ারাও অনার্যসমাজ থেকে স্ত্রী গ্রহণ করতে সঙ্কুচিত হতেন না; শান্তনু তো অনার্য দাসকন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করেছিলেন। রাজা দেবকও এক অনার্য শূদ্রকন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। নিষাদরাজ নলও বিদর্ভরাজার মেয়ে দময়ন্তীকে বিয়ে করেছিলেন। ভীমও রাক্ষসী হিড়িম্বাকে বিবাহ করেছিলেন। মহাভারতীয় যুগে অনার্য সমাজের বিবাহপ্রথাসমূহ যে আর্যসমাজে গৃহীত হয়েছিল, তা বিভিন্ন শ্রেণীর বিবাহের নামকরণ থেকে বুঝতে পারা যায়, যথা রাক্ষস-বিবাহ, অসুর-বিবাহ, গান্ধর্ব-বিবাহ ইত্যাদি। বস্তুত মহাভারতীয় যুগে গান্ধর্ব-বিবাহের তো আমরা ছড়াছড়ি দেখি, যথা শান্তনুর সঙ্গে গঙ্গার বিবাহ ('গঙ্গা'

শব্দটা মুণ্ডা শব্দ), ভীমের সঙ্গে হিড়িম্বার বিবাহ, অর্জুনের সঙ্গে উলুপি ও চিত্রাঙ্গদার বিবাহ ও ইক্ষ্বাকুবংশীয় (যে বংশে রাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন) পরীক্ষিতের সঙ্গে সুশোভনার বিবাহ।

রামায়ণ যে মহাভারতের আগেই রচিত হয়েছিল, তা আর এক দিক দিয়েও প্রকাশ পায়। রামায়ণে মহাভারতীয় কোন ঘটনার উল্লেখ নেই। মহাভারতে কিন্তু রামায়ণের ঘটনার উল্লেখ আছে। যথা সভাপর্বে যুধিষ্ঠির দ্বিতীয়বার দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হলে বৈশম্পায়ন তাঁকে যে কথা বলেছিলেন তার মধ্যে রামের উল্লেখ আছে। বনপর্বে ভীম যখন দ্রৌপদীর জন্য স্বর্ণপদ্ম আনতে স্বর্গদ্বারের দিকে গিয়েছিলেন, তখন হনুমানের সঙ্গে দুজনের রামায়ণ সম্বন্ধে অনেক কথা হয়েছিল। এছাড়া, বনপর্বে রামায়ণকথা বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। দ্রোণপর্বেও অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন—'বালীবধের জন্য রামচন্দ্রের যেমন কলঙ্ক হয়েছে দ্রোণবধের জন্য আপনার সেরূপ চিরস্থায়ী কলঙ্ক হবে।'

রাম-রাবণের যুদ্ধটাকে আমরা আর্যদের সঙ্গে অনার্যদের যুদ্ধের প্রতিধ্বনি হিসাবেও ধরে নিতে পারি। এর আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয়। সেটা হচ্ছে শিব বড় না বিষ্ণু বড় প্রমাণ করা। শিব অনার্য দেবতা; রাবণ তাঁর পরম ভক্ত। সুতরাং রাম বিষ্ণুর অবতার হিসাবে রাবণকে নিধন করার মানেই হচ্ছে—শিব তাঁর ভক্তকে রক্ষা করতে পারেননি। তবে মনে হয় বাল্মীকির রামকে বিষ্ণুর অবতার হিসাবে প্রতিপন্ন করবার উদ্দেশ্য ছিল না। এটা পরবর্তীকালের প্রক্ষিপ্ত ব্যাপার। কেননা, বাল্মীকি তাঁর রামায়ণে বিষ্ণুর অবতার তো দূরের কথা, একজন সাধারণ মানুষের চেয়েও রামের চরিত্রকে হীনতর করেছেন। যেমন কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের সূচনায় আমরা রামকে কামার্ত অবস্থায় দেখি। সেখানে লক্ষ্মণের মত অনুজ রামকে উপদেশ দিয়ে বলছেন—'পুরুষোত্তম, আপনি চিত্ত স্থির করে বিরহ কষ্ট সংবরণ করুন; আপনার মত জিতেন্দ্রিয় নির্মল চরিত্র পুরুষের এরূপ চিত্তবিকার শোভনীয় নয়।' লক্ষ্মণেরও ঊর্মিলার বিরহে কাতর হবার কথা। কিন্তু তাঁর কাতরতার কোন বহিঃপ্রকাশ নেই। সেদিক থেকে রাম অপেক্ষা লক্ষ্মণ বেশি জিতেন্দ্রিয়। লক্ষ্মণ যে রাম অপেক্ষা বেশি জিতেন্দ্রিয় ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। রাবণ যখন সীতাকে অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছিল, সীতা তখন তাঁর বসন ও অলঙ্কারসমূহ (চীর পরিধানের বিরোধী কথা), ভূতলে নিক্ষেপ করেছিলেন। পরে লক্ষ্মণ যখন রাম কর্তৃক সেগুলি সনাক্ত করতে আদিষ্ট হন, লক্ষ্মণ তখন বলেছিলেন—'আমি তাঁর কেয়ূর ও কুণ্ডল চিনতে পারছি না। কেবল নূপুর দ্বারা চিনতে পারছি, কেননা আমি সর্বদা তাঁর পাদবন্দনা করতাম।' (নাহং জানামি কেয়ূরং নাহং জানামি কুণ্ডলে। নূপুরত্বভিজানামি নিত্যং পদাভিবন্দনাৎ॥) এই উক্তি থেকেই লক্ষ্মণের চরিত্রমাহাত্ম্য প্রকাশ পায়। তিনি মাতৃবৎ ভাবীর চরণ ব্যতীত অন্য কোন অঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করতেন না। তথাকথিত বিষ্ণুর অবতার রাম অপেক্ষা লক্ষ্মণ যে অনেকগুণ জিতেন্দ্রিয় ছিলেন, তা একদিকে বসন্ত উদ্গমে রামের সীতার জন্য কামার্ত হয়ে ওঠা ও অপরদিকে লক্ষ্মণের একবারও ঊর্মিলার জন্য কাতর না হওয়া বা মোটেই চিন্তা না করা থেকে প্রকাশ পায়। বিষ্ণুর অবতার হয়েও রাম যে জিতেন্দ্রিয় ছিলেন না, তা রামের প্রতি লক্ষ্মণের উক্তি থেকেই প্রকাশ পায়। বানর হয়েও সুগ্রীব রামকে লজ্জা দিয়ে বলেছিলেন—'আমি হীনজাতীয় বানর হয়েও মহৎ ব্যসন প্রাপ্ত হয়েও শোক করছি না।' বিষ্ণুর অবতার হয়ে রামের হীনতা আবার প্রকাশ পায় যখন তিনি নিজ স্বার্থসাধন প্রকল্পে অক্ষত্রিয়ের ন্যায় বালীকে বাণবিদ্ধ করে নিহত করেছিলেন। সেখানেও বালী রামকে বলেছিল—'তুমি শঠ, প্রতারক, ক্ষুদ্রচেতা এবং তোমার মন মিথ্যাশ্রিত। কি করে তোমার মত পাপাত্মা দশরথের ঔরসে জন্মগ্রহণ করল?' (৫।৪৩)। আবার বিষ্ণুর অবতাররূপে সর্বজ্ঞ হয়েও তিনি উত্তরকাণ্ডে কি করে বললেন—'যদি শুদ্ধসমাচারা যদি বা বীতকল্মষা।

করোত্বিহাত্মনঃ শুদ্ধিমনুমান্য মহামুনিম্॥' 'জানকীর চরিত্র যদি বিশুদ্ধ হয়, এবং তিনি যদি পাপবিহীন হন, তবে তিনি মহামুনির (বাল্মীকির) অনুমতি নিয়ে নিজ শুদ্ধির পরিচয় দিন।' মোটকথা, যদিও বাল্মীকি প্রচলিত আখ্যানসমূহের সংযোজনে একখানা মহাকাব্য রচনা করে রামকে বিষ্ণুর অবতাররূপে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁর সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। তার প্রমাণ তাঁর (বর্তমানে প্রচলিত) কাব্যের মধ্যেই আছে। তাছাড়া, তাঁর কাব্যের মধ্যে বহু পরস্পরবিরোধী ঘটনা বা উক্তির সমাবেশ আছে। তিনি বালীকে নিহত করবার কারণ দিয়েছিলেন যে সে (বালী) সুগ্রীবের পত্নীকে হরণ করেছিল। অথচ পরমুহূর্তেই তিনি বালীপত্নী তারাকে সুগ্রীবের অঙ্কশায়িনী করেছিলেন। বালীর মৃত্যুর পর তারার যে বিলাপ (যা কালিদাসের কুমারসম্ভবের 'রতিবিলাপ'-এর অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল) তা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। অথচ সেই বীরভার্যা তারাকে তিনি সুগ্রীবের আসক্তা করে তুলেছেন। এছাড়া, রামায়ণের মধ্যে এমন সব অবাস্তব ঘটনার সমাবেশ আছে, যার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই, যেমন রাবণের দশমুণ্ড, হনুমানের বিশল্যকরণী চিনতে না পেরে সমস্ত পাহাড়টাকেই মাথায় করে নিয়ে আসা, কর্দমপুত্র রাজা ইলার একমাস পুরুষ ও একমাস সুন্দরী নারী হওয়া, ঋক্ষরাজার পরমাসুন্দরী নারীতে পরিণত হওয়া ইত্যাদি। এসব অবাস্তব ঘটনাই রামায়ণের ঐতিহাসিক মূল্যকে নষ্ট করে দিয়েছে। সুগ্রীব প্রভৃতিকে বানর বলাও বাল্মীকির কল্পনাপ্রসূত, কেননা তাদের পিতা সুষেণই ছিল সে যুগের একজন সুদক্ষ শল্যচিকিৎসক।

মহাভারতেও যে অলৌকিক ঘটনা নেই, তা নয়। যেমন গরুড় গজকচ্ছপ খান, কোন বিশেষ সরোবরে অবগাহন করলে পুরুষ নারী হয়ে যায়, মনুষ্যজন্মের জন্য নারীগর্ভ অনাবশ্যক—মাছের পেট, শরের ঝোপ বা কলসীই জরায়ুর কাজ করে ইত্যাদি। কিন্তু এরূপ অস্বাভাবিক ঘটনার সমাবেশ মহাভারতে খুব কমই আছে। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর স্রোতে সেগুলো ভেসে যায়। মহাভারতের ঘটনাবলীর যে একটা ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, রামায়ণে তা খুব কম আছে। রাম-রাবণের যুদ্ধের ন্যায় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কোন অলীক ঘটনা নয়। মহাভারতের ঘটনাবলীর বাস্তবতা আছে। অবশ্য দুটো মহাকাব্যের মধ্যেই প্রক্ষিপ্ত অংশ খুব বেশি। মহাভারতের অভ্যন্তরীণ প্রমাণ থেকেই জানতে পারা যায় যে গোড়াতে মহাভারতে মাত্র ৮,৮০০ শ্লোক ছিল। তারপর শ্লোক সংখ্যা বাড়তে বাড়তে আশি হাজারে দাঁড়িয়েছে ও হরিবংশ ধরলে এক লক্ষ দশ হাজার। কিন্তু মহাভারতের মধ্যে এত প্রক্ষিপ্ত অংশ থাকলেও ঐতিহাসিক সত্য সহজেই বের করা যায়।

মহাভারত কিভাবে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে, তা দ্রৌপদীর বিবাহ থেকেই বুঝতে পারা যায়। দ্রৌপদীর বিবাহ-কাহিনী থেকে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি যে, মহাভারতের কাহিনীকথার যুগে বিবাহ সম্পাদন করবার জন্য যজ্ঞনিষ্পাদন, মন্ত্র উচ্চারণ, সপ্তপদীগমন ইত্যাদি বিধিসম্মত কোন পদ্ধতির প্রয়োজন হত না। ওই বিবাহ-কাহিনী অনুযায়ী পাণ্ডব ভ্রাতারা দ্রৌপদীকে জয় করে এনে কিছুকাল তার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীরূপে বসবাস করেছিলেন। পরে তাঁরা আবার দ্রুপদ রাজার গৃহে ফিরে গিয়েছিলেন যজ্ঞ সম্পাদন ও আচার-অনুষ্ঠান পালনের জন্য। মনে হয় পরবর্তীকালের রীতিপ্রথার সঙ্গে খাপ খাওয়াবার জন্যই মহাভারতের মধ্যে এই অংশটি উত্তরকালে প্রক্ষিপ্ত করা হয়েছিল (আমার 'ভারতের বিবাহের ইতিহাস', পৃষ্ঠা ২১ দেখুন)।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে কুরু-পাঞ্চাল যুদ্ধ বলা হয়। আমার মনে হয় এটা উত্তর ভারতের সঙ্গে প্রাচ্য ভারতের যুদ্ধ। এই উভয়ের মধ্যে সীমারেখা হচ্ছে বারাণসী। যাঁরা এটাকে কুরু-পাঞ্চাল যুদ্ধ বলেন, তাঁদের সঙ্গে অবশ্য আমার কোন বিরোধ নেই, যদি তাঁরা পাঞ্চাল দেশের সঠিক অবস্থান নির্ণয় করেন। আমি আমার 'বাঙলার সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছি যে যাঁরা

মনে করেন পাঞ্চালরাজ্য উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত, তাঁদের ওটা ভুল বলেই মনে হয়। কেননা, এরূপ মতবাদ পাণিনির 'কাশিকা' টীকার বিরোধী। 'কাশিকা' টীকায় পরিষ্কার বলা হয়েছে যে পাঞ্চাল রাজ্য বিদেহ, অঙ্গ ও বঙ্গের সঙ্গে প্রাচ্য দেশে অবস্থিত। এই মতবাদ মহাভারতের আর এক আখ্যানের দ্বারা সমর্থিত হয়। পাণ্ডবদের বসবাসের জন্য গঙ্গা নদীর উত্তর তীরে বরণাবত নগরে জতুগৃহ নির্মিত হয়েছিল। আমার মতে মহাভারতের বরণাবত ও বর্তমান বারাউনি অভিন্ন। বিদুর কর্তৃক প্রেরিত জলযানে আরোহণ করে পাণ্ডবরা পূর্বদিকে রওনা হয়ে প্রভাতকালে গঙ্গা নদীর দক্ষিণ তীরে অবতরণ করেছিলেন। মনে হয় সে জায়গাটা হচ্ছে রাজমহলের নিকটবর্তী কোন স্থান। তারপর তাঁরা ঘোর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পথ অতিক্রম করে অবশেষে একচক্রা নগরে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। এই ঘোর জঙ্গল সাঁওতাল পরগনারই জঙ্গল হবে, এবং তা অতিক্রম করে তাঁরা বীরভূম প্রদেশে প্রবেশ করে একচক্রা নগরে বাস করতে শুরু করেছিলেন। এখান থেকেই তাঁরা একদিন পাঞ্চালরাজ্যে গিয়ে স্বয়ংবর সভা থেকে দ্রৌপদীকে জয় করে এনেছিলেন। সুতরাং পাঞ্চালরাজ্য যে একচক্রা নগরের নিকটবর্তী কোন দেশ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। পাণিনি ভরতরাজাদের প্রাচ্য ভারতের রাজা বলেছেন, এবং তাঁর সে উক্তি পতঞ্জলি তাঁর 'মহাভাষ্য'-এ সমর্থন করেছেন। এই সকল তথ্যপ্রমাণ থেকে পরিষ্কার প্রকাশ পায় যে পাণ্ডবরা প্রাচ্য ভারতের লোক ও কৌরবরা উত্তর ভারতের লোক, এবং এই উভয়ের সার্বভৌমত্ব নিয়েই কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। (লেখকের 'মহাভারত ও সিন্ধু সভ্যতা' দ্রঃ)

সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্ম

বাংলায় 'সংস্কৃতি' একটা বহুল ব্যবহৃত শব্দ। এর দ্বারা হিন্দুর সমগ্র জীবনচর্যাকে বুঝায়। হিন্দুর জীবনচর্যা কোনদিনই এলোমেলোভাবে বা বিশ্রস্ত ধারায় চলেনি। এর জন্য ছিল বিশেষ বিধান-ব্যবস্থা। আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত বিধান-ব্যবস্থাকেই 'ধর্ম' বলা হত। সেজন্য যে শাস্ত্রদ্বারা বিধান-ব্যবস্থাসমূহ প্রতিষ্ঠিত হত, তাকে আমরা 'ধর্মশাস্ত্র' বলতাম। আজ যাকে আমরা সংস্কৃতি বলি, সেটা আর অন্য কিছুই নয়, সেটা হচ্ছে এই 'ধর্ম'-এর অনুশীলন মাত্র। আমাদের হিন্দুর 'ধর্ম' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নীতির ভিত্তিতে। ব্যষ্টি ও সমষ্টির সামাজিক ও মানসিক উন্নতি ও সংস্কার সাধনের জন্যই নীতির প্রয়োজন ছিল এবং ধর্মশাস্ত্রগুলির মাধ্যমেই সেই নীতিগত সংস্কারসমূহ প্রবর্তিত হত।

'ধর্মশাস্ত্র'-এর অপর অভিধা ছিল স্মৃতি। মনু-ও সে কথা বলেছেন—'ধর্মশাস্ত্রম্ তু বৈ স্মৃতি'। যাজ্ঞবল্ক্য নিম্নলিখিত ২০ জন ধর্মশাস্ত্রকারের নাম উল্লেখ করেছেন—মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনস, অঙ্গিরস, যম, আপস্তম্ভ, সম্বর্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লোহিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ ও বশিষ্ঠ। পরাশরও ২০ জন স্মৃতিকারের নাম করেছেন, তবে যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে তাদের নামের কিছু পার্থক্য আছে। এই প্রবন্ধ লেখার সময় আমার সামনেও ২০ খানা স্মৃতিগ্রন্থ রয়েছে। সেগুলির সঙ্গেও উক্ত তালিকার পার্থক্য আছে। আমার সামনে যে স্মৃতিগ্রন্থগুলি রয়েছে তাদের মোট শ্লোক সংখ্যা হচ্ছে ৪০,৫৭৭। তার মধ্যে সকলের চেয়ে বেশি সংখ্যক শ্লোক আছে পরাশর স্মৃতিতে। এর মোট শ্লোক সংখ্যা হচ্ছে ২,৭২৮। তারপর হচ্ছে মনু। মনুর মানবধর্মশাস্ত্রে আছে ২,৬৮৪ শ্লোক। তারপর স্থান হচ্ছে বৃদ্ধহারীত স্মৃতির। এতে আছে ২,৩৯৯ শ্লোক। সবচেয়ে কম শ্লোক আছে শঙ্খ ও উশনস সংহিতায়। শঙ্খের শ্লোক সংখ্যা হচ্ছে ৩২ ও উশনসের ৫১। হাজারের ওপর শ্লোক আছে অঙ্গিরস (১,১১৩) ও নারদ (১,৮০০) স্মৃতিতে। এছাড়াও অসংখ্য স্মৃতিগ্রন্থ লেখা হয়েছিল। এগুলি লেখা হয়েছিল বিভিন্ন প্রদেশ ও বিভিন্ন সময়ে। সেজন্য স্মৃতিগ্রন্থগুলির মধ্যে বিধানের ঐক্য দেখা যায় না। একই বিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন স্মৃতিতে বিভিন্ন বিধান দেওয়া হয়েছে। যেহেতু সমাজের সংহতি স্মৃতিগ্রন্থসমূহে প্রদত্ত বিধানের ওপর নির্ভর করে, সেজন্য পাছে পরস্পরবিরোধী বিধান সমাজের সংহতিকে নষ্ট করে, সেই কারণে সামাজিক বিশৃঙ্খলা নিবারণের জন্য বৃহস্পতি বিধান দিলেন—'মন্বর্থ বিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে'। তার মানে, যে স্মৃতি মনুর বিপক্ষে বিধান দেয়, সে স্মৃতি স্মৃতিই নয়। এক কথায়, সমাজকে সংহত অবস্থায় রাখবার জন্য শেষ পর্যন্ত মনুর বিধানই গৃহীত হয়েছিল। তবে এটা সদাচারের কথা। সদাচার ছাড়া ছিল দেশাচার, লোকাচার, কুলাচার ও স্ত্রী আচার। সমাজ এ সবগুলিরই অনুমোদন দেয়। এরই ওপর হিন্দু সমাজের সংহতি নির্ভর করেছিল। তবে মুসলমান আক্রমণের পর হিন্দু সমাজ যখন বিধ্বস্ত হয়েছিল, তখন নতুন বিধানকারদের আবির্ভাব হয়েছিল। তাদের মধ্যে ছিল বিজ্ঞানেশ্বর, ভবদেব ভট্ট, জীমূতবাহন ও রঘুনন্দন।

মনুর মানবধর্মশাস্ত্রে যে সমাজবিন্যাসের চিত্র দেওয়া হয়েছে তা চতুর্বর্ণের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সেটা ছিল পিতৃকেন্দ্রিক সমাজ। সে সমাজে নারীর কোন স্বাতন্ত্র্য ছিল না। চতুর্বর্ণ বলতে মৌলিক চারটি শ্রেণীকে বুঝাত—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। তবে মানবধর্মশাস্ত্রের দশম

অধ্যায়ে এক সম্প্রসারিত সমাজের চেহারাও দেখতে পাওয়া যায়। উপরি-উক্ত চারিবর্ণের মধ্যে অসবর্ণ মিলনের ফলে অনেক সংকর জাতির উদ্ভব হয়েছিল। দশম অধ্যায়ে এই সংকর জাতির মধ্যে যাদের নাম দেওয়া হয়েছে তারা হচ্ছে—মুর্ধাভিষিক্ত, কৈবর্ত, করণ বা কায়স্থ, অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য, আয়োগব, ধিগবন, পুক্কস ও চণ্ডাল। এদের সকলেরই ভিন্ন কর্ম বা বৃত্তি ছিল। সুতরাং বৃত্তিভিত্তিক জাতি বা শ্রেণীর উদ্ভব এ যুগেই হয়েছিল। তবে সামাজিক সংগঠনের মধ্যে এদের স্থান মর্যাদা নির্দেশের পিছনে ব্রাহ্মণদের কিছু উষ্মা ছিল বলে মনে হয়। কেননা, ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় যদি পিতা হতেন তা হলে তাকে অম্বষ্ঠ বা উগ্র নামে অভিহিত করে ব্রাহ্মণদের অব্যবহিত পরেই তাদের স্থান দেওয়া হত। আর ব্রাহ্মণী যদি মাতা হতেন, তাহলে তাঁকে চণ্ডাল নাম দিয়ে সমাজের একেবারে নীচে তার স্থান নির্দিষ্ট হত। এক কথায়, চণ্ডালের মা হতো ব্রাহ্মণী, আর অম্বষ্ঠের পিতা হত ব্রাহ্মণ। যেহেতু পিতৃকেন্দ্রিক সমাজে নারীর কোন স্বাতন্ত্র্য ছিল না সেজন্য ব্রাহ্মণীকে সমাজের এই পাঁতি মাথা পেতে নিতে হত।

স্মৃতিকারদের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবাহ ছিল ধর্মবিহিত কর্তব্যকর্ম বা সংস্কার। সকল ব্যক্তির পক্ষেই এই কর্তব্যপালন বাধ্যতামূলক ছিল, বিশেষ করে পুত্র উৎপাদন করে নরক থেকে পিতৃপুরুষদের উদ্ধারের জন্য। যদিও মনুর মানবধর্মশাস্ত্রে আট রকম বিবাহের কথা বলা হয়েছে, এবং আপস্তম্ভ ও বশিষ্ঠ ছয় রকম বিবাহের অনুমোদন করেছেন, তথাপি নীতির কারণে মাত্র সেই বিবাহকেই শাস্ত্রসম্মত বিবাহ বলে গণ্য করা হত, যে বিবাহে মন্ত্র উচ্চারিত হত, হোম ও যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হত ও সপ্তপদীগমন অবলম্বিত হত। ব্রাহ্মণের পক্ষে এই বিবাহই ছিল প্রশস্ত বিবাহ। তবে ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে আসুর-বিবাহের প্রচলন ছিল। আসুর-বিবাহে মাল্যদান করে কন্যার পাণিগ্রহণ করা হত। সেজন্যই মানবগৃহ্যসূত্রে বলা হয়েছে যে, বিবাহ মাত্র দুই প্রকার—ব্রাহ্ম ও আসুর। যদিও মহাভারতীয় যুগে গান্ধর্ব ও রাক্ষস-বিবাহ আদর্শ বিবাহ বলে গণ্য হত, স্মৃতির যুগে এই উভয়প্রকার বিবাহই অপ্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। ধর্মশাস্ত্রসমূহে বলা হয়েছে যে, এরূপ বিবাহ করলে মানুষকে মহাপাপে লিপ্ত হতে হয়।

স্মৃতির যুগে মেয়েদের বিবাহ যে কেবল সার্বজনীন ছিল তা নয়, বিবাহ বাধ্যতামূলকও ছিল। যথাসময়ে মেয়ের বিবাহ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সমস্ত স্মৃতিগ্রন্থেই বিশেষ করে জোর দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, মেয়েদের পক্ষে বিবাহের উপযুক্ত বয়স হচ্ছে দশ, যখন সে 'কন্যা' আখ্যা লাভ করে। পরাশর বিধান দিয়ে বলেছেন—'যথা সময়ে যদি মেয়ের বিবাহ দেওয়া না হয়, তা হলে সেই কন্যার মাসিক রজঃ অপর জগতে তার পিতৃপুরুষদের পান করতে হয় এবং যে তাকে বিবাহ করে, তাকে হতভাগ্য হতে হয়'। বশিষ্ঠ, বৌধায়ন, নারদ ও যাজ্ঞবল্ক্য এ সম্পর্কে বেশ ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছেন—'কুমারী অবস্থায় কন্যা যতবার রজঃস্বলা হবে, ততবার তার পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের ভ্রূণ হত্যার পাপে লিপ্ত হতে হবে।' গৌতমও এ সম্বন্ধে অন্যান্য স্মৃতিকারদের সঙ্গে মতৈক্য প্রকাশ করে বলেছেন—'রজঃস্বলা হবার আগেই কন্যার বিবাহ দেওয়া চাই।' (আমার 'ভারতের বিবাহের ইতিহাস' দ্রঃ)

হিন্দুর বিবাহ ছিল অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। তার মধ্যেই নিহিত ছিল পরিবারের স্থায়িত্ব। এবং এই পরিবারের স্থায়িত্বের ওপর নির্ভর করত সমাজের সংহতি। হিন্দুর বিবাহ যে সবর্ণেই হত তা নয়। অসবর্ণেও হত। সবর্ণে বিবাহকে 'অনুলোম' বিবাহ বলা হত, আর অসবর্ণ বিবাহকে বলা হত 'প্রতিলোম' বিবাহ। এই উভয় প্রকার বিবাহের যে ফসল, তার সমাজে একটা নির্দিষ্ট স্থান ছিল, যদিও আজকের দৃষ্টিভঙ্গিতে সে স্থানগুলি অবিসংবাদিত নয়। তা হলেও প্রাচীন সমাজ সে ব্যবস্থা মেনে নিয়েছিল, কেননা তার পিছনে ছিল ধর্মশাস্ত্রের চাপ।

না মানলে, পাপপুণ্যের ভয় দেখানো হত। আগেকার দিনের মানুষের পাপপুণ্যের ভয়টা ছিল অত্যন্ত বেশি। যেটার শাস্ত্রীয় অনুমোদন নেই সেটাই হলো পাপ। এবং এই পাপের ভয়েই সমাজ সংহত অবস্থায় থাকত। পাপের ভয়কে অগ্রাহ্য করে মানুষ যখন 'অসামাজিক' কোন কাজ করত, তখন তাকে একঘরে করা হত। তখনকার দিনের মানুষ জানত 'একঘরে' হওয়াটা কি ভীষণ বিপদের ব্যাপার।

ধর্মশাস্ত্রসমূহে শুধু বিবাহ সম্বন্ধেই বিধান দেওয়া হয়নি। ধর্মানুষ্ঠান, খাদ্যাখাদ্য, শ্রাদ্ধ, প্রায়শ্চিত্ত, উত্তরাধিকার প্রভৃতি হাজার রকম বিষয় সম্পর্কে অনুশাসন দেওয়া হয়েছিল। বলা বাহুল্য, এসব অনুশাসন না মানলে পাপ হত। মনু খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে যে সকল বিধান দিয়েছিলেন, সেগুলি এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। যথা: অভক্ষ্যের তালিকায় আছে সিদ্ধ চাউল, লশুন (রসুন), পলাণ্ডু (পিঁয়াজ), গঞ্জন, কবক (ব্যাঙের ছাতা), শেলু বা চালতা, প্রসবের পর দশদিন অতিক্রান্ত হয়নি সেরূপ গাভীর দুধ, মহিষ ব্যতীত যাবতীয় পশুর দুধ, পারাবতাদি গ্রামবাসী পক্ষী, টিট্টিভ, চড়ুই, জলকাক, হংস, চক্রবাক, গ্রাম্য কুক্কুট, রজ্জুবাল, ডাক ও শুকসারিকা, টিয়া, শালিক, বক, বলাকা, শূকর প্রভৃতির মাংস। মৎস্যভোজনও পরিত্যাগ করতে বলা হয়েছে—'মৎস্যাদঃ সর্বমাংসাদস্তস্মান্মৎস্যান বিবর্জয়েৎ' (৫।১৫)। তবে বোয়াল, রুই, রাজীব ও সিংগি ও আঁইশবিশিষ্ট যাবতীয় মৎস্য ভক্ষণ করা যেতে পারে, যদি তা প্রথমে দেবপিতৃ উদ্দেশে উৎসর্গ করে তবে ভক্ষণ করা হয়। (৫।৫-১৬)। মনুর যুগে গোমাংস ভক্ষণ পরিত্যক্ত হয়েছিল। মহাভারতের শিবি উপাখ্যান থেকে জানতে পারা যায় যে, এককালে নরমাংসও ভক্ষিত হত। তা-ও মনুর যুগে পরিত্যক্ত হয়েছিল। তবে মনুর যুগে উচ্চকোটি ও নিম্নকোটির লোকদের মধ্যে, ও উত্তর ভারত ও বাঙলার ব্রাহ্মণদের মধ্যে, খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে অনেক পার্থক্য ছিল।

সমাজ কোন এক বিশেষ জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেনি। বিভিন্ন যুগে তার বিবর্তন ঘটেছিল। এই বিবর্তনমূলক সামাজিক সচলতা নানা কারণে ঘটত। মনে হয় আর্যরা যখন প্রথম এদেশে এসেছিল, তখন তাদের মধ্যে কোনরূপ শ্রেণীবিভাগ ছিল না। তবে প্রাগার্যদের মধ্যে যে শ্রেণীবিভাগ ছিল, তার প্রমাণ আমরা হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো, কালিবঙ্গান প্রভৃতি স্থান থেকে পাই। সমাজকে শাসন করত যারা, তারা বাস করত পরিখাবেষ্টিত নগরের মধ্যে এক উচ্চ পাটাতনের ওপর নির্মিত দুর্গ অঞ্চলে। আর নীচের শহরে বাস করত সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর লোকেরা। আবার ঘরবাড়ি তৈরির বিন্যাস থেকে দেখা যায় যে নীচের শহরে যারা বাস করত তাদের মধ্যেও শ্রেণীবিভাগ ছিল। এসব শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল নানা বৃত্তিধারী শ্রেণী ও শ্রমিক সম্প্রদায়।

ঋগ্বেদের যুগেই আর্যরক্তের সঙ্গে অনার্যরক্তের মিশ্রণ ঘটেছিল। তখন তারা প্রাগার্য সমাজের শ্রেণীবিভাগ, গোত্রবিভাগ ইত্যাদি অনুকরণ করেছিল। এই শ্রেণীবিভাগ ঋগ্বেদের এক অতি নবীন বিভাগে (১০।৯০।১২) প্রথম উল্লিখিত হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছে যে প্রজাপতির 'মুখ ব্রাহ্মণ হল, দুবাহু রাজন্য হল, ঊরু বৈশ্য হল ও দু পা শূদ্র হল'। এই প্রসিদ্ধ সূক্তকে 'পুরুষসূক্ত' বলা হয়, এবং এটা অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে রচিত হয়েছিল। ঋগ্বেদের অন্য কোন অংশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি বর্ণের উল্লেখ নেই। মোট কথা, ঋগ্বেদ রচনাকালে আর্যদের মধ্যে কোন বর্ণবিভাগ ছিল না। ব্যাকরণবিদ পণ্ডিতগণ প্রমাণ করেছেন যে 'পুরুষসূক্ত'-এর ভাষা বৈদিক ভাষা নয়, অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্কৃত। তবে এ থেকে একটা জিনিস প্রমাণিত হয়: একই পুরুষের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে বিভিন্ন বর্ণ উৎপন্ন হয়েছিল। মোট কথা, আর্যদের মধ্যে গোড়ার দিকে কোন জাতিভেদ-প্রথা ছিল না, এবং

থাকলেও লোক এক জাতি থেকে অপর জাতিতে উন্নীত হতে পারত। এর প্রমাণ এবং প্রতিধ্বনি আমরা পরবর্তীকালের ধর্মগ্রন্থসমূহ থেকেও পাই। যেমন পরবর্তীকালের ধর্মগ্রন্থসমূহ থেকে আমরা জানতে পারি যে আর্যরা বহু অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে (যেমন সত্যকাম জবাল, মহীদাস ঐতরেয়) নিজেদের গোষ্ঠীভুক্ত করে নিয়েছিল। পরবর্তীকালের কোন কোন ধর্মশাস্ত্রেও আমরা এর সমর্থন পাই। যেমন কপিল স্মৃতি-তে বলা হয়েছে—'চারবার হিরণ্যগর্ভ দান করলে শূদ্রেরও উপনয়ন-সংস্কার অধিকার হয়, এবং উপনয়ন-সংস্কার করলে শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হবে। অষ্টাদশবার তুলাপুরুষ দান করলে শূদ্র ক্ষত্রিয়ত্বও প্রাপ্ত হয়।' ('হিরণ্যগর্ভদানস্য চতুর্বারকৃতস্য তু ম হিয়া বৃষলস্যাপি মৌঞ্জ্যামধিকৃতির্ভবেৎ ততোহপি কৃতরা মৌঞ্জ্যাশুদ্রো ব্রাহ্মণ্যমৃচ্ছতি/তুলাষ্টাদশধা জ্ঞেয়া তত্রাদৌ রাজতা স্মৃতা (কপিল স্মৃতি: শ্লোক সংখ্যা ৮৯৬-৮৯৭, আর্যশাস্ত্র সংস্করণ)। এককথায় গোড়ার দিকে আর্যদের মধ্যে সামাজিক সচলতা বা সোস্যাল মোবিলিটি ছিল। শূদ্রও ব্রাহ্মণ হতে পারত। ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করে বিশ্বামিত্র মুনিও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন। সুতরাং ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব, জন্ম বা রক্তের বিশুদ্ধতার ওপর নির্ভর করত না। যথাযথ সংস্কারের ওপর তা নির্ভর করত।

কিন্তু পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিজাতির মধ্যে পার্থক্যটা যখন ঘনীভূত হল, তখন জাতি সম্বন্ধে তাদের মনে একটা গোঁড়ামির সঞ্চার হল। তখন তাদের মনে রক্তের বিশুদ্ধতা, আচার-ব্যবহারের শুচিতা প্রভৃতি প্রাধান্য লাভ করল। এমন কি ব্রাহ্মণরা নিজেদের মধ্যে পরস্পর শূচিতা রক্ষার জন্য বাতিকগ্রস্ত হয়ে উঠল। এ সম্বন্ধে উত্তরপ্রদেশে প্রচলিত এক প্রবচন যথেষ্ট আলোকপাত করে। প্রবচনটা হচ্ছে—'তিন কনৌজিয়া তেরা চুলি'। তার মানে, তিন কনৌজ ব্রাহ্মণ যদি একত্রিত হয়, তাহলে তাদের শুচিতা রক্ষার জন্য তেরটা রন্ধনশালার প্রয়োজন হয়। তাদের এ শুচিতা কোথা থেকে এল ? রক্তের বিশুদ্ধতা থেকে ? তা তো নয়। কেননা, পঞ্চনদ ও উত্তরপ্রদেশ যেভাবে বিদেশী রক্তের দ্বারা কলুষিত হয়েছে, ভারতের আর কোন প্রদেশের রক্ত ততটা কলুষিত হয়নি। আর্যদের আসবার পর ওই অঞ্চলের রক্ত প্রথম কলুষিত হয়েছিল আখামেনিদদের রক্তের দ্বারা। এ সম্বন্ধে বেহিস্তুনের পাঁচটি স্তম্ভলিপি যথেষ্ট আলোকপাত করে। এই স্তম্ভলিপিগুলির তারিখ হচ্ছে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর গোড়ার দিক। এই স্তম্ভলিপিগুলি থেকে আমরা জানতে পারি যে পঞ্জাব ও হিন্দুস্থানের (হিরোদতাসের 'হিন্দু') কিছু অংশ আখামেনিদ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। তারপর ৩২৬ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে ঘটে আলেকজান্ডারের ভারত-আক্রমণ। যদিও আলেকজান্ডার অল্পদিনের জন্য ভারতে ছিলেন, তথাপি তাঁর উত্তরাধিকারিগণ বেশ কিছু দিন উত্তর-পশ্চিম ভারতে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করেছিল। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে দিমিত্রাস ও শেষের দিকে মিলিন্দের রাজত্বকালে উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের কিছু অংশ গ্রীকদের অধীনে যায়। তারপর আসে শকেরা। তারা ভারতে কুশাণবংশের রাজ্যশাসন প্রতিষ্ঠা করে। এ সমস্ত জাতি খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত ভারতে আধিপত্য বিস্তার করে ও ভারতের জনসমুদ্রে মিশে যায়। তারপর আসে হূনেরা। ৫২৮ খ্রিস্টাব্দে মালবাধিপতি যশোবর্মন কর্তৃক পরাজিত না হওয়া পর্যন্ত তারাও ভারতে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। এরা সকলেই ভারতীয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। এই সকল বিদেশী আক্রমণ ও আধিপত্যের সময় ব্রাহ্মণরা কি কোনরূপ 'চৈনিক প্রাচীর' নির্মাণ করে নিজেদের রক্তের বিশুদ্ধতা ও আচারের শুচিতা রক্ষা করেছিলেন ? কই, ইতিহাস তো তা বলে না। তবে তাদের রক্তের বিশুদ্ধতা ও আচার-ব্যবহারের শুচিতা সম্বন্ধে এত গুমোর কেন ?

হিন্দুসমাজের ওপর এরূপ প্রতিঘাত শুধু বাহির থেকে আসেনি। ভিতরেও বিপ্লব ঘটেছিল

বুদ্ধের আবির্ভাবের সময় থেকে। সম্রাট আশোকের সময় থেকে কুষাণদের আমল পর্যন্ত ভারতে বৌদ্ধধর্ম প্রবল হয়ে উঠেছিল। এই সময় হিন্দুসমাজ একভাবে একস্থানে দাঁড়িয়ে ছিল না। বহমান ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সঙ্গে খাপ খাইয়ে ও জীবনযাত্রা প্রণালীকে চলমান রেখে, ধর্মের সংহতি রক্ষার জন্য হিন্দুসমাজ ক্রমাগতই তার বিধানসমূহকে পরিবর্তিত করে নিয়েছিল। বস্তুত হিন্দুধর্ম যদি জাতীয় জীবনের সহিত পরিবর্তনশীল না হত, তা হলে হিন্দুধর্ম বহুদিন পূর্বেই লোপ পেয়ে যেত। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লেখা হয়েছিল বলেই, আমরা ধর্মশাস্ত্রসমূহে পরস্পরবিরোধী বিধান দেখি এবং এই বিরোধ সমন্বয়ের জন্যই শেষ পর্যন্ত সমাজকে মনুর আশ্রয় নিতে হয়েছিল। কিন্তু দেশ যখন মুসলমান কর্তৃক আক্রান্ত ও অধিকৃত হল তখন মনুর বিধান আর সমাজকে সংবদ্ধ রাখতে সক্ষম হল না। সমাজ ও সংস্কৃতির সংহতি রক্ষার জন্য নতুন নতুন বিধানকারদের আবির্ভাব হল। এটা আমরা বিশেষ করে বাঙলার ইতিহাসে দেখি। মুসলমান অধিকারের পূর্বেই বাঙলার সমাজে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর বাঙলায় পাল-সম্রাটগণের আমলে বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। জাতিভেদপ্রথা প্রায় একেবারে উঠে গিয়েছিল। সেজন্য পালদের পর যখন সেন রাজাদের আধিপত্য ঘটল, এবং তাঁরা ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন, তখন আবার নতুন করে জাতিবিন্যাসের প্রয়োজন হল। কাজটাকে সহজ করবার জন্য ব্রাহ্মণ ছাড়া সব জাতিকেই সংকর জাতি বলা হল। নতুন বিধানকাররা উত্তরাধিকার ও খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে নতুন নতুন বিধান দিতে লাগলেন। উত্তর ভারতের জন্য বিজ্ঞানেশ্বর যেমন রচনা করেছিলেন 'মিতাক্ষরা', বাঙালার জন্য তেমনই জীমূতবাহন তৈরি করলেন 'দায়ভাগ'। এগুলি হচ্ছে মনুরই একরকম পরিবর্তিত ও সংক্ষিপ্ত ভাষ্য। জীমূতবাহন ছাড়া, নতুন বিধানকারদের মধ্যে উল্লেখনীয় হচ্ছেন ভবদেব ভট্ট ও রঘুনন্দন। দুজনেই ছিলেন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। প্রাচীনকাল থেকেই ধর্মশাস্ত্রসমূহ লেখা হয়েছিল উচ্চকোটির লোকদের (elites) জন্য। রঘুনন্দনই প্রথম নিম্নকোটির লোকদের (masses) প্রতি দৃষ্টি দিলেন। মুসলমানগণ কর্তৃক বাঙলা অধিকৃত হবার পর লোককে জোরজলুম করে মুসলমান করা হত। তবে অনেক হিন্দু স্বেচ্ছায়ও মুসলমান হত। এরা অধিকাংশই হিন্দুসমাজের অবহেলিত নিম্নকোটির লোক। নিষ্ঠাবান হিন্দুসমাজ বরাবরই এদের হেয় চক্ষে দেখত। এ সকল সম্প্রদায় ইসলামের সাম্যনীতির দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিল। এছাড়া ছিল পদস্খলিতা হিন্দু-সধবা ও বিধবা। এরা ইসলামধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান পতি বা উপপতির পরিবারে বিবির স্থান পেত। (লেখকের 'বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' দ্রঃ) রঘুনন্দন দেখলেন এভাবে যদি হিন্দুসমাজ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তা হলে হিন্দু একেবারে লোপ পেয়ে যাবে। তাঁর সামনে এটা একটা 'চ্যালেঞ্জ' রূপে দেখা দিল। আগে যে সব বিদেশী আক্রমণকারীরা এসেছিল, তারা হিন্দুই হয়ে গিয়েছিল। তাতে হিন্দুসমাজ প্রসারিত হয়েছিল। কিন্তু মুসলমানগণ কর্তৃক ধর্মান্তরিতকরণের ফলে হিন্দুসমাজ ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছিল। সেজন্য রঘুনন্দন বিধান দিলেন যে মাত্র একটা সংক্ষিপ্ত প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা এরূপ ধর্মান্তরিত লোকেরা আবার হিন্দু হতে পারবে।

খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধেও মধ্যযুগের হিন্দুসমাজে অনেক পরিবর্তন ঘটল। ভবদেব ভট্টই প্রথম বাঙালি ব্রাহ্মণের আমিষ ভোজনের বিধান দিলেন। ভবদেব ভট্ট বাঙালি ব্রাহ্মণের আমিষ ভোজনের বিধান দিলেন বটে, কিন্তু বাঙালি ব্রাহ্মণের সিদ্ধ চাউল ও মসুরির ডাল ভক্ষণের অনুমতি দিলেন না। পরে রঘুনন্দনই বাঙালি ব্রাহ্মণের পাতে সিদ্ধ চাউলের ভাত ও মসুরির ডাল দিলেন। এরপর বিদেশী তরকারি যথা আলু, কপি, টম্যাটো ইত্যাদিও ব্রাহ্মণরা খেতে আরম্ভ করল। উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণরা তাদের গোঁড়ামি কিছুদিন বজায় রাখল বটে, পরে তারাও এসব তরকারি খেতে আরম্ভ করল। (লেখকের 'বাঙলার সামাজিক ইতিহাস' দ্রঃ)

আর্যরা যখন এদেশে এসেছিলেন, তখন এটা জনশূন্য দেশ ছিল না। নানা নরগোষ্ঠীর লোক এখানে বাস করত। তাদেরও সমাজ ছিল এবং সে-সমাজে সংহতি রক্ষার জন্য তাদের 'ধর্ম' বা 'সংস্কৃতি' ছিল। সে ধর্ম বা সংস্কৃতির আমরা সম্যক্ পরিচয় পাই সভ্যতার নিদর্শনসমূহের মধ্যে। তবে আর্য সংস্কৃতির সঙ্গে সে সংস্কৃতির একটা বড় রকমের পার্থক্য ছিল। সে সংস্কৃতি ছিল মোটামুটি বৈষয়িক সংস্কৃতি। আর আর্যদের সংস্কৃতি ছিল যাজকীয় আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি। প্রাগার্য সংস্কৃতির মধ্যেও দেবতার উপাসনা বা যাজকীয় ব্যাপার ছিল। তবে তা আর্যদের অনুরূপ নয়। প্রাগার্য সমাজের লোকেরা শিবের প্রতিরূপ কোন পুরুষ দেবতার ও মাতৃকাদেবীর পূজা করত। সেখানেই আমরা প্রথম শিবের ও শক্তির আদিরূপ দেখতে পাই। লিঙ্গ পূজাও তারা করত। মনে হয়, প্রাগার্যদের ধর্মটাই পরবর্তীকালে তন্ত্রধর্মে বিকশিত হয়েছিল। তার মূল আমরা অথর্ববেদে বর্ণিত 'ব্রাত্য' ধর্মের মধ্যে পাই। 'ব্রাত্য' ধর্মকে আর্যরা ঘৃণার চক্ষে দেখতেন।

আর্যদের দেবতামণ্ডলীর কথা পরে বলছি। তার আগে বলে নিতে চাই আর্যধর্মের আধ্যাত্মিক চরিত্র সম্বন্ধে। তাঁদের আধ্যাত্মিক চিন্তা প্রতিবিম্বিত হয়ে আছে চারি বেদে। তা ছাড়া উপনিষদসমূহ ছিল তাঁদের দার্শনিক চিন্তার আধার। এছাড়া তাঁরা অনুশীলন করতেন বেদাঙ্গের—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ।

এখনও পর্যন্ত আমাদের যতটুকু জানা আছে বেদসংহিতাই হচ্ছে আর্যদের প্রাচীনতম রচনা। কিন্তু আর্যদের শিক্ষাদীক্ষা সবই উচ্চকোটির লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সেজন্য পরবর্তীকালে যখন আর্য ও অনার্য সভ্যতার সংশ্লেষণ ঘটল তখন আর্যদের উচ্চকোটির সংস্কৃতি নিম্নকোটির লোকদের আকৃষ্ট করতে পারল না। তখন অনার্যসমাজের বহু আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি আর্যদের গ্রহণ করতে হল। এই সংশ্লেষণের ফলে যে নতুন ধর্ম সৃষ্টি হল, তাই হিন্দুধর্মের রূপ ধারণ করল। প্রাচীন আর্যধর্ম তখন পশ্চাদ্‌পসরণ করল। সেটা আমরা আর্যদের উপাসনা-পদ্ধতি ও দেবতামণ্ডলীর পরিবর্তন থেকে বুঝতে পারি।

মনে হয় আর্যরা এদেশে আসবার আগে তাদের সাধারণ মাতৃভূমিতে দৌস্পতিই প্রধান দেবতা ছিল। কেননা, তারই অনুকল্প দেবতাকে Zeus নামে আমরা গ্রীকপুরাণে পাই। তবে যাস্ক তাঁর নিরুক্তে বলেছেন যে আর্যদের মাত্র তিনটি প্রধান দেবতা ছিল—অগ্নি, ইন্দ্র (বা বায়ু) ও সূর্য। এই তিন দেবতা যথাক্রমে মর্ত্য, নভঃ ও স্বর্গের অধিপতি ছিলেন। তারপর আর্যরা অনেক নতুন দেবতার পত্তন করেছিল, যথা—মিত্র, বরুণ, সবিতা, পুষণ, বিষ্ণু, উষা, অশ্বিন ও চন্দ্রমা। আর্যরা যখন পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে সরস্বতী নদীর তীরে তাদের যজ্ঞকর্মাদি করতে লাগল, তখন তারা সরস্বতী নদীকেও দেবতামণ্ডলীতে স্থান দিল।

আজ আমরা যাকে হিন্দুধর্ম, হিন্দু সংস্কৃতি ও হিন্দুসমাজ নামে অভিহিত করি, তার অভ্যুত্থান ঘটেছিল পৌরাণিক যুগে। পুরাণগুলি রচিত হয়েছিল অনেক পরে—ভারতের ইতিহাসের গুপ্তযুগে। বেদ উপনিষদের চর্চা তখনও চলেছিল বটে, কিন্তু তার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা উচ্চকোটির লোকের (elites) মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। পুরাণগুলির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাদের সার্বজনীনত্ব। বৈদিক ধর্মকে পিছনে হটে যেতে হয়েছিল—পৌরাণিক ধর্মের জন্য স্থান করে দেবার জন্য। দুই ধর্মের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান ছিল। বৈদিক ধর্ম ছিল যজ্ঞসম্পাদনের ধর্ম; পৌরাণিক ধর্ম ছিল পূজা-অনুষ্ঠান সম্পাদনের ধর্ম। যজ্ঞসমূহ ব্যয়সাপেক্ষ অনুষ্ঠান ছিল। সেজন্য মাত্র উচ্চকোটির লোকদের পক্ষেই তা সম্পাদন করা সম্ভবপর ছিল। পূজা-অনুষ্ঠান সম্পাদনের ব্যয় ছিল স্বল্প; সেজন্য সাধারণ লোক তা সম্পাদন করতে পারত। সেজন্যই পৌরাণিক ধর্মসমাজের সকলকেই আকৃষ্ট করেছিল।

পৌরাণিক ধর্মের উদ্ভব ঘটেছিল হিন্দুসমাজের ওপর বৌদ্ধধর্মের প্রতিঘাতের ফলে। সুঙ্গ

প্রভৃতি কয়েকটি স্বল্পস্থায়ী রাজবংশের কথা বাদ দিলে মৌর্যসম্রাট অশোকের সময় থেকে গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠার সময় পর্যন্ত—এই পাঁচ ছয় শত বৎসর ভারতে বৌদ্ধধর্মের আধিপত্য ঘটেছিল। বৌদ্ধরাই প্রথম নিম্নকোটির লোকদের মধ্যে প্রচলিত জনপ্রিয় লৌকিক দেবতাসমূহকে নিজেদের দেবমণ্ডলীতে স্থান দিয়েছিল। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে জাতিভেদপ্রথা উঠে গিয়েছিল এবং মূর্তি পূজার প্রবর্তন ঘটেছিল। গুপ্তবংশীয় রাজারা যখন পুনরায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন তখন তাঁরা হিন্দুসমাজ ও ধর্মকে এক নতুন ছাঁদে ঢেলে সাজলেন। সমাজের প্রসার ও সংহতি রক্ষার জন্য সকলকেই টেনে আনা হল সমাজের মধ্যে সংকর ও অন্ত্যজ জাতি হিসাবে। বৌদ্ধ চৈত্যসমূহের অনুকরণে হিন্দুমন্দির তৈরি হল। আর্যসমাজে প্রবেশ করল অনার্য প্রাচীন লৌকিক দেবতাসমূহ, যেগুলি নিম্নকোটির লোকদের মধ্যে জনপ্রিয় ছিল। অনেক নারীদেবতা এল পুরুষদেবতার স্ত্রী বা শক্তি হিসাবে। তাছাড়া তাদের বাহন দেওয়া হল। বাহনগুলি আর কিছুই নয়, অনার্য নিম্নকোটি সমাজের কুল-প্রতীক মাত্র। বৈদিক দেবতাসমূহ হয় অপসারিত হল, আর তা নয় তো নতুন পৌরাণিক ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হল। ইন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব চলে গেল, তিনি মাত্র একজন লোকপাল হিসাবে নিভৃতে বাস করতে লাগলেন। নতুন পৌরাণিক দেবতামণ্ডলীতে সর্বোচ্চ স্থান পেলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। তাঁদের মধ্যে ব্যাপকভাবে পূজিত হতে লাগলেন বিষ্ণু ও মহেশ্বর। সঙ্গে সঙ্গে পূজা পেতে আরম্ভ করলেন তাঁদের স্ত্রী লক্ষ্মী ও দুর্গা। বিষ্ণু আর্যদেবতা ; শিব বা মহেশ্বর অনার্য দেবতা। এইভাবে নতুন ধর্মে আর্য ও অনার্য দেবতার অপূর্ব সম্মিলন ঘটল। প্রাগার্যকালের ন্যায় নারী দেবতারাই বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করলেন। শিবের ভক্তরা শৈব ও বিষ্ণুর ভক্তরা বৈষ্ণব নামে আখ্যাত হলেন। সমাজে প্রথমে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন বিরোধিতা ছিল না ; কিন্তু পরে তা কোথাও কোথাও প্রকাশ পেল। তখন হরিহর মূর্তির কল্পনা করে ধর্ম ও সমাজ—এই দুইয়ের সংহতি রক্ষা করা হল। (লেখকের 'ডিনামিক্স অব সিনথেসিস্ ইন হিন্দু কালচার' দ্রঃ)।

এদের নিয়ে পুরনো যুগের অনেক আখ্যান ও উপকাহিনী স্থান পেল পুরাণসমূহে। যেহেতু এই সংশ্লেষণ ঘটল আর্য পুরোহিত-সম্প্রদায়ের অধীনে সেজন্য বিষ্ণুকেই স্থান দেওয়া হল সর্বোচ্চ স্বর্গে বৈকুণ্ঠে, আর শিবকে স্থান দেওয়া হল মর্ত্যের সর্বোচ্চ পাহাড়ে কৈলাসে। বৈকুণ্ঠে অধিষ্ঠিতা হলেন বিষ্ণুপ্রিয়া হিসাবে লক্ষ্মী, আর কৈলাসে শিবজায়া হিসাবে দুর্গা। এরই কিছু পরে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল সুপ্ত অবস্থায় অবস্থিত প্রাগার্যকালের তন্ত্রধর্ম। এ ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে পরবর্তী অধ্যায়ে।

তন্ত্রধর্মের উৎস ও বিকাশ

আগেই বলা হয়েছে যে সভ্যতার সূচনা হয়েছিল ভূমিকর্ষণ নিয়ে। ভূমিকর্ষণই মানুষকে বাধ্য করেছিল স্থায়ী বসবাস স্থাপনে। এই স্থায়ী বসবাস প্রথমে গ্রামের রূপ নিয়েছিল, পরে বিকশিত হয়েছিল নগরে। স্থায়ী বসবাস স্থাপনের পূর্বে মানুষ ছিল যাযাবর প্রাণী। কেননা, তখন পশুমাংসই ছিল তার প্রধান খাদ্য। পশুশিকারের জন্য তাকে স্থান থেকে স্থানান্তরে ভ্রমণ করতে হত। পশুশিকার ছিল পুরুষের কর্ম। আর ভূমিকর্ষণের সূচনা করেছিল মেয়েরা। পশু শিকারে বেরিয়ে পুরুষের যখন ফিরতে দেরি হত, তখন মেয়েরা ক্ষুধার তাড়নায় গাছের ফল (ইভের গাছের ফল খাওয়া তুলনা করুন) এবং ফলাভাবে বন্য অবস্থায় উৎপন্ন খাদ্য শস্য খেয়ে প্রাণধারণ করত। তারপর তাদের ভাবনাচিন্তায় স্থান পায় এক কল্পনা। সন্তান উৎপাদনের প্রক্রিয়া তাদের জানাই ছিল। যেহেতু ভূমি বন্য অবস্থায় শস্য উৎপাদন করে, সেইহেতু তারা ভূমিকে মাতৃরূপে কল্পনা করে নেয়। যুক্তির আশ্রয় নিয়ে তারা ভাবতে থাকে পুরুষ যদি নারীরূপ ভূমি (আমাদের সমস্ত ধর্মশাস্ত্রেই মেয়েদের 'ক্ষেত্র' বা 'ভূমি' বলে বর্ণনা করা হয়েছে) কর্ষণ করে সন্তান উৎপাদন করতে পারে, তবে মাতৃরূপ পৃথিবীকে কর্ষণ করে শস্য উৎপাদন করা যাবে না কেন? তখন তারা পুরুষের লিঙ্গস্বরূপ এক যষ্টি বানিয়ে নিয়ে ভূমি কর্ষণ করতে থাকে। (Przyluski তাঁর 'Non-Aryan Loans in Indo-Aryans' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে 'লিঙ্গ', 'লাঙ্গুল' ও 'লাঙ্গল' এই তিনটা শব্দ একই ধাতুরূপ থেকে উৎপন্ন।) মেয়েরা এইভাবে ভূমিকর্ষণ করে শস্য উৎপাদন করল। যখন ফসলে মাঠ ভরে গেল, তখন পুরুষরা তা দেখে অবাক হল। লক্ষ্য করল লিঙ্গরূপী যষ্টি হচ্ছে Passive, আর ভূমিরূপী পৃথিবী ও তাদের মেয়েরা হচ্ছে active। Active মানেই হচ্ছে শক্তির আধার। ফসল তোলার পর যে প্রথম নবান্ন উৎসব হল সেই উৎসবেই জন্ম নিল লিঙ্গ ও ভূমিরূপী পৃথিবীর পূজা। এ সম্বন্ধে Clodd তাঁর Animism গ্রন্থে বলেছেন :

'In earth worship is to be found the explanation of the mass of rites and ceremonies to ensure fertilisation of the crops and cattle and woman herself,'

এই আদিম ধারণা থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল শিব ও শক্তির কল্পনা। এবং এদের উপাসনা নিয়েই উদ্ভূত হয়েছিল তন্ত্রধর্ম। সুতরাং তন্ত্রধর্মটা হচ্ছে মূলত এক অতি প্রাচীন ধর্ম, যদিও পরবর্তীকালে এটা বিকশিত হয়েছিল নানারূপে। শিব ও শক্তির আরাধনা মোটেই বৈদিক উপাসনা পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত ছিল না। লিঙ্গ পূজা নবপলীয় যুগ থেকেই হয়ে এসেছে (লেখকের 'Beginnings of Linga Cult in India' in 'Annals of the Bhandarkar Oriental Institute' 1929 দ্রষ্টব্য)। আর আদি শিব ও মাতৃকাদেবীর পূজার অজস্র নিদর্শন আমরা প্রাগার্য সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রসমূহে পেয়েছি।

মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা প্রভৃতি নগরে দেবীপূজার যে ব্যাপক প্রচলন ছিল, তা মৃন্ময়ী মাতৃকাদেবীর মূর্তিসমূহ থেকে প্রকাশ পায়। পুরুষ দেবগণ কর্তৃক অধিকৃত ঋগ্বেদের দেবতামণ্ডলীতে মাতৃদেবীর কোন স্থান ছিল না। পরবর্তীকালে যখন সাংস্কৃতিক সমন্বয় ঘটেছিল, তখনই প্রাগার্য দেবীসমূহের হিন্দুধর্মে অনুপ্রবেশ ঘটে। যেমন বৈদিকযুগের অন্তিমে আমরা

কালী, করালী প্রভৃতি দেবীর নাম পাই। কিন্তু তখনও তারা অদের মৌলিক স্বরূপ বা স্বতন্ত্রতা বজায় রেখে অনুপ্রবেশ করতে পারেননি। তারা বৈদিক অগ্নি উপাসনারই অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল। কিন্তু আর্যরা যত পূর্বদিকে অগ্রসর হতে লাগল, তাদের ধর্মীয় গোঁড়ামি ততই হ্রাস পেতে লাগল। তখন এইসব অনার্য দেবতা বেশ রীতিমত হানা দিয়ে আর্যমণ্ডলীতে তাঁদের আসন করে নিল। পুরাণাদি গ্রন্থে আমরা বিন্ধ্যবাসিনী, পর্ণশবরী প্রভৃতি দেবীকে অনার্যদেবীর স্বরূপেই পাই। তারপর মাতৃপূজা প্রাগার্য তন্ত্রধর্ম ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে প্রভাবান্বিত করে।

অথর্ববেদের পঞ্চদশ কাণ্ডে যে ব্রাত্যধর্মের বর্ণনা আছে, তা প্রাচ্য ভারতে প্রচলিত তন্ত্রধর্মেরই অনুরূপ কোন ধর্ম। তাদের ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের জন্য আর্যরা প্রথমে ব্রাত্যদের ঘৃণা করতেন। আর্যরা বলতেন তারা বেদবিহিত কোন যজ্ঞাদি ক্রিয়া করবার অধিকারী নয়। কিন্তু পরে অথর্ববেদের যুগেই তাদের মনোভাব পরিবর্তিত হয়। কেননা, অথর্ববেদের সমস্ত পঞ্চদশ কাণ্ডটাকেই ব্রাত্যমহিমা বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে—'ব্রাত্য পুরুষ মহানুভব, দেবপ্রিয়, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় তেজের মূল, অধিক কি ব্রাত্য পুরুষ দেবাদিদেব।' ব্রাত্যধর্মের বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এর অনেক উপাদানই তন্ত্রধর্মের উপাদান। এটাই প্রাচ্যভারতের ধর্ম ছিল।

তন্ত্রধর্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে 'সূত্রকৃতঙ্গ' নামে এক প্রাচীন জৈনগ্রন্থ বিশেষ আলোকপাত করে। এটা সকলেরই জানা আছে যে, তন্ত্রের আচার-অনুষ্ঠান ও পদ্ধতি অত্যন্ত গূঢ় এবং উক্ত প্রাচীন জৈনগ্রন্থ অনুযায়ী গূঢ় সাধনপদ্ধতি শবর, দ্রাবিড়, কলিঙ্গ ও গৌড় দেশবাসীদের এবং গন্ধর্বদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। মনে হয় এই জৈন গ্রন্থের কথাই ঠিক, কেননা, তান্ত্রিক সাধনসদৃশ ধর্মপদ্ধতি পূর্বে ভারতের প্রাক্-বৈদিক জনগণের মধ্যেই প্রচলিত ছিল এবং উহাই 'ব্রাত্যধর্ম' বা অনুরূপ কোন ধর্ম হবে। (লেখকের 'History & Culture of Bengal' গ্রন্থ দেখুন)। পরে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ হিন্দুরা যখন উহা গ্রহণ করেছিল, তখন তারা দার্শনিক আবরণে তাকে মণ্ডিত করেছিল।

বজ্রযান ছিল বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্ম। এই ধর্মের উদ্ভব ঘটেছিল পূর্বভারতে বাঙলাদেশে, এবং নিঃসন্দেহে বাঙলার লোকায়ত তান্ত্রিক ধর্মের প্রভাবে। তারনাথের মতে তন্ত্রের উৎপত্তি বহু পূর্বেই হয়েছিল, কিন্তু উহা সুপ্ত অবস্থায় ছিল, এবং গোপনভাবে গুরুশিষ্য পরম্পরায় লুক্কায়িত ছিল। পালরাজাগণের পৃষ্ঠপোষকতায় ও সিদ্ধাচার্যদের সক্রিয় প্রভাবে উহা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বজ্রযানের চারটি কেন্দ্র বা পীঠস্থান ছিল, উড্ডীয়ান, কামাখ্যা, শ্রীহট্ট ও পূর্ণগিরি। এই চারটি পীঠস্থানেই একটা করে বজ্রযোগিনীর মন্দির ছিল। অষ্টম শতাব্দীতে বজ্রযানের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রবলভাবে চলে। বৌদ্ধরাই তন্ত্রের গূঢ় সাধন-পদ্ধতি লিখিতভাবে প্রথম প্রকাশ করে। তারা যে তন্ত্রগ্রন্থ প্রথম রচনা করে তার নাম হচ্ছে 'গুহ্যসমাজতন্ত্র'। সম্ভবত খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে অসঙ্গ কর্তৃক এ-খানা রচিত হয়েছিল।

বজ্রযানীদের কল্পনায় আদি বুদ্ধই হচ্ছেন সৃষ্টির কারণ। তিনি সর্বব্যাপী। সৃষ্টির প্রত্যেক অণুপরমাণুতে তিনি বিদ্যমান। সেজন্য সৃষ্টির প্রতিটি বস্তুই স্বভাবসিদ্ধ শূন্যরূপ নিঃস্বভাব ও বুদ্বুদ স্বরূপ। কেবল শূন্যই নিত্য। আদি-বুদ্ধই হচ্ছেন এই শূন্যের রূপকল্পনা। এই শূন্যই হচ্ছে 'বজ্র'। সেজন্য দেবতা হিসাবে আদি বুদ্ধকে বজ্রধর বলা হয়। তাঁর শক্তি প্রজ্ঞাপারমিতা। কোন কোন মূর্তিতে তাঁকে প্রজ্ঞাপারমিতার সঙ্গে যুগনদ্ধ অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। তবে একক মূর্তিও পাওয়া যায়। একক অবস্থায় তিনি শূন্য, আর যুগনদ্ধ অবস্থায় তিনি বোধিচিত্ত। একটি শূন্যতা, অপরটি করুণা। বজ্রযানীদের সাধনার লক্ষ্য হচ্ছে বোধিচিত্ত লাভ করা। বোধিচিত্তে কেবল মহাসুখের অনুভূতি ছাড়া আর কোন অনুভূতি থাকে না। এই মহাসুখের মধ্যে চিত্তের নিমজ্জনই হচ্ছে পরম নির্বাণ। দেহই হচ্ছে এ সাধনার অবলম্বন। বোধিচিত্তের উৎপাদনে

মণিমূলই আনন্দের উৎপত্তিস্থল। সে আনন্দ সর্বপ্রকার প্রকৃতিদোষমুক্ত। সে আনন্দের উর্ধ্বায়নই হচ্ছে বোধিচিত্ত বা পরামার্থ লাভ। তখন সাধকের দেবতার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে।

বৌদ্ধরা যখন তন্ত্রের গুহ্যসাধনপদ্ধতি প্রকাশ করে দিলেন, তখন হিন্দুরা আর চুপ করে বসে রইল না। তারাও এই লোকায়ত গুহ্যসাধনা সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হল। তারা প্রথমে যে ধর্ম প্রচার করল, সেটা হচ্ছে নাথধর্ম। সমস্ত তান্ত্রিক সাধনাই হচ্ছে গুরুবাদী ধর্ম। যেহেতু তারা যোগমার্গে সিদ্ধ ছিল, সেজন্য নাথধর্মাবলম্বীদের যোগী বলা হত। নাথপন্থ বা নাথধর্ম শৈবধর্মেরই একটা শাখা বিশেষ। এর ওপর বৌদ্ধ ও তন্ত্রধর্মের প্রভাব ছিল। কথিত আছে, শিব যখন দুর্গাকে গুহ্যতত্ত্বের উপদেশ দিচ্ছিলেন, তখন নাথধর্মাবলম্বীদের আদিপুরুষ মীননাথ গোপনে তা শুনেছিলেন। শিবই নাথদের আরাধ্য দেবতা এবং 'কায়াসাধনই' নাথদের চরম লক্ষ্য। নাথধর্ম প্রধানত বাঙলার নিম্নকোটির লোকদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। তবে এই ধর্মকে অবলম্বন করে যে সাহিত্য গড়ে উঠেছিল, তা থেকে আমরা মীননাথের শিষ্য গোরক্ষনাথ, গোরক্ষনাথের শিষ্যা রানী ময়নামতী, রানী ময়নামতীর পুত্র গোপীচন্দ্র ও তাঁদের নানারূপ অলৌকিক শক্তির কথা জানতে পারি। ধর্মটি এক সময় সুদূর পেশওয়ার থেকে ওড়িশা পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।

নাথধর্মকে অবলম্বন করে যেমন একটা সাহিত্য গড়ে উঠেছিল, হিন্দু তন্ত্রধর্মকে অবলম্বন করেও এক বিরাট সাহিত্য গড়ে উঠেছিল। তার আগে তন্ত্রের সাধনপদ্ধতির গোপন ব্যাখ্যা হত। বলা হত—'কুলবর্ত্ম গোপনীয়ম'। 'আগমতন্ত্রবিলাস' অনুযায়ী হিন্দুতন্ত্রের সংখ্যা হচ্ছে ১৪৭। এছাড়া বরাহীতন্ত্রে আরও ৫৪ খানি হিন্দুতন্ত্রের নাম আছে। হিন্দুতন্ত্রগুলি অধিকাংশই মধ্যযুগে রচিত হয়েছিল। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর একখানা প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় তন্ত্র গ্রন্থ হচ্ছে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ রচিত 'তন্ত্রসার'।

তন্ত্রোক্ত উপাসনা পদ্ধতিসমূহ আলোচনা করলে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এইসব বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে—মূলমন্ত্র, বীজমন্ত্র, মুদ্রা, আসন, ন্যাস, দেবতার প্রতীক স্বরূপ বর্ণরেখাত্মক যন্ত্র, সাধনার সময় মৎস্য, মাংস, মদ্য, মুদ্রা ও মৈথুন এই পঞ্চ-মকারের ব্যবহার; উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ প্রভৃতি ষট্‌কর্মের আশ্রয় গ্রহণ ও যোগানুষ্ঠান। তবে সব সম্প্রদায়ের উপাসনার মধ্যেই যে এসব বৈশিষ্ট্য আছে, তা নয়। যথা, যারা বামাচারী তান্ত্রিক সাধক তারাই মৎস্য, মাংস, মদ্য, মুদ্রা ও মৈথুন এই পঞ্চ-মকারের আশ্রয় গ্রহণ করে। নারীসঙ্গমই এই উপাসনার ভিত্তি। এই সাধনায় নারীসঙ্গমের ভূমিকা সম্বন্ধে তারা যে ব্যাখ্যা করে, তার সমস্তটাই হচ্ছে রহস্যময়, গূঢ় ও গুহ্য। তন্ত্র মতে নারীর দুই স্বরূপ—কামিনী ও জননী—একই।

তন্ত্রগ্রন্থসমূহে বলা হয়েছে যে 'মৈথুন' ছাড়া কুলপূজা হয় না। যেমন গুপ্তসংহিতায় বলা হয়েছে—'কুলশক্তিম বিনা দেবী যো জপেত স তু পামর।' আবার বলা হয়েছে যে, সে নারী নিজের স্ত্রী হলে চলবে না। এ সম্বন্ধে নিরুত্তরতন্ত্রে বলা হয়েছে 'বিবাহিতা পতিত্যাগে দূষণম্ ন কুলার্চনে'। তার মানে কুলপূজার জন্য সধবা স্ত্রীলোক যদি তার পতিত্যাগ করে, তবে তার কোন দোষ হয় না। মাত্র সধবা হলেই চলবে না। সে ষোড়শী, সুন্দরী, কামবর্জিতা ও বিপরীত-রমণদক্ষ্যা হওয়া চাই। ('বিপরীতরতা সা তু ভবিতা হৃদয়োপরি')। এরূপ কুলপূজায় রতা নারীকে কুলনায়িকা বলা হয়। কুমারীতন্ত্রে বলা হয়েছে যে নটী, কাপালিকা, বেশ্যা, ব্রাহ্মণী, শূদ্র কন্যা, মালাকার কন্যা, নাপিত স্ত্রী, রজকী ও গোপাল-কন্যা—এই নববিধ কন্যাই এই কার্যে প্রশস্ত। বিকলাঙ্গী, বিকৃতাঙ্গা, সন্দিগ্ধচিত্তা, বৃদ্ধা, পাপযুক্তা, হুঙ্কারকারিণী, অর্থলুব্ধা, অভক্তচিত্তা এবং কাতরা রমণীকে এই কার্যে ত্যাগ করবে। কুলচূড়ামণিতন্ত্রে বলা

হয়েছে বিশেষভাবে লীলাচাতুর্য থাকলে যাবতীয় কুলাঙ্গনাই শক্তিরূপে গৃহীত হতে পারে। (বিশেষবৈদগ্ধ যুতাঃ সর্ব এব কুলাঙ্গনা)। কুলচূড়ামণিতন্ত্রে আরও বলা হয়েছে যে, অন্য রমণী যদি না আসে তা হলে নিজের কন্যা, নিজের কনিষ্ঠা বা জ্যেষ্ঠা ভগিনী, মাতুলানী, মাতা বা বিমাতাকে নিয়ে কুলপূজা করবে। ('অন্যা যদি ন গচ্ছেত্তু নিজকন্যা নিজানুজা। অগ্রজা মাতুলানী বা মাতা বা তৎ সপত্নিকা॥ পূর্বাভাবে পরা পূজ্যা মদংশা যোষিতো মতাঃ। একা চেৎ কুলশাস্ত্রজ্ঞ পূজার্হা তত্র ভৈরব॥')

কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করাই তান্ত্রিক সাধনার উদ্দেশ্য। এই শক্তি মূলাধারস্থ পদ্মমৃণালে (যোনিমূলে) কুণ্ডলাকারে সর্পবৎ সুপ্ত অবস্থায় নিহিত থাকে। জাগ্রত করলে ইহা দেহস্থ সূক্ষ্মতন্তুবৎ ও সুষুম্না নাড়ীর (মেরুদণ্ড) মধ্য দিয়ে ছয়টি পদ্ম বা চক্রের পথে প্রবাহিত হয়, ও একে জাগরিত করে। ('আদৌ পূরকযোগেন স্বাধারে যোজয়েন্মনঃ। গুদমেঢ্রান্তরে শক্তিং তামাকুঞ্চ্য প্রবোধয়েৎ'॥)

রাত্রিকালে সাধক 'আমি শিব' ('ধ্যাত্বা শিবোহমতি') এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে নগ্ন অবস্থায় নগ্না রমণী রমণ করত ('ততো নগ্নাং স্ত্রিয়ং নগ্না রমণ ক্লেদযুতোহপি বা') রাত্রি তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত নিজ সাধন কার্যে লিপ্ত থাকবে। কুলার্ণবতন্ত্র অনুযায়ী এই সাধন প্রক্রিয়া কী, তা আমি আর বাংলায় অনুবাদ করব না। মূল সংস্কৃত শ্লোকই এখানে উদ্ধৃত করছি—"আলিঙ্গনং চুম্বনঞ্চ স্তনয়োমর্দনস্তথা। দর্শনং স্পর্শণং যোনের্বিকাশো লিঙ্গঘর্ষণম্॥ প্রবেশ স্থাপনং শক্তের্ণব পুষ্পানি পূজনে"। সাধারণ পাঠককে তন্ত্রের গুহ্য রহস্যময় জগতে আর নিয়ে যেতে চাই না। সেজন্য এ সম্বন্ধে এখানেই থেমে যাচ্ছি।

বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবতামণ্ডলীর ন্যায়, হিন্দু তান্ত্রিক দেবতামণ্ডলীতেও অসংখ্য দেবদেবী আছেন। তবে তাঁদের মধ্যে দশমহাবিদ্যাই হচ্ছেন প্রধান। এই দশমহাবিদ্যা হচ্ছেন—'কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী। ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা। বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা। এতা দশমহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ।' এই সকল দেবতার ধ্যানমন্ত্র থেকে আমরা তাঁদের আকৃতির পরিচয় পাই।

তান্ত্রিক সাধকরা তাঁদের সাধনা করেন বীজমন্ত্র ও যন্ত্রের সাহায্যে। বীজমন্ত্রের ভাষা সহজে বোধগম্য নয়। ভাষা বোধ হয় আদিমকালের হবে।

তন্ত্রধর্ম ও আমাদের সমাজজীবন, সাহিত্যসাধনা, স্বদেশপ্রেম প্রভৃতির ওপর সে ধর্মের প্রভাব সম্বন্ধে অনেক কিছু বলবার আছে, কিন্তু তা এই স্বল্প পরিসরের মধ্যে বলা সম্ভবপর নয়, সেজন্য এখানেই আমি ক্ষান্ত হচ্ছি।

সমাজগঠনে জাতিভেদ

হিন্দুসমাজ গঠিত হয়েছিল জাতিভেদ প্রথার ওপর। এই সমাজে প্রতি জাতির এক একটা বিশেষ বৃত্তি ছিল। তার ফলে অর্থনৈতিক জীবনে এক শ্রেণীর সঙ্গে অপর শ্রেণীর কোনরূপ বিরোধিতা ছিল না। এই সুসংবদ্ধ অর্থনৈতিক বিন্যাসই হিন্দুসমাজকে দৃঢ় করে তুলেছিল।

হিন্দুসমাজে ছিল অসংখ্য জাতি। কিন্তু গোড়ার দিকে মাত্র চারটি শ্রেণী ছিল। এদের বর্ণ বলা হত। এই চতুর্বর্ণের ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজকে চাতুর্বর্ণ সমাজ বলা হত। চতুর্বর্ণ হচ্ছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এদের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে প্রমাণসূত্র খাড়া করা হয়, সেটা ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের পুরুষ-সূক্ত (১০।৯০।২২) কিন্তু আগের নিবন্ধে দেখানো হয়েছে যে, ঋগ্বেদের পুরুষ-সূক্ত অপেক্ষাকৃত আধুনিক। তার মানে, বর্ণভেদ প্রথা ঋগ্বেদের উত্তরকালে উদ্ভূত হয়েছিল। মনে হয় এটা উদ্ভূত হয়েছিল যখন আর্যরা পূর্বদিকে কুরু-পঞ্চাল দেশ। (গঙ্গা ও যমুনার অন্তর্বর্তী অঞ্চল) পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। এখানেই আর্যদের আপোস করতে হয়েছিল অনার্যদের ভাষ্য, সভ্যতা ও লোকযাত্রার সঙ্গে।

আর্যরা যখন এদেশে আসে, তখন একাধিক নরগোষ্ঠীর (races) লোক এখানে বাস করত। এটা মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত নরকঙ্কাল থেকে প্রমাণিত হয়। অন্তত তিনটি প্রধান নরগোষ্ঠী ছিল—(১) আলপীয় আর্য, (২) দ্রাবিড় ভাষাভাষী ভূমধ্যসাগরীয় নরগোষ্ঠী ও (৩) দেশজ প্রটো-অস্ট্রালয়েড জাতি। আর্যভাষাভাষী আলপীয় নরগোষ্ঠীর লোকেরা ছিল হ্রস্ব-কপালবিশিষ্ট, মাথার খুলি অপেক্ষাকৃত ছোট ও চওড়া, খুলির পিছনের অংশ গোল, নাক লম্বা, মুখ গোল ও গায়ের রঙ ফরসা। আর বৈদিক আর্যরা ছিল দীর্ঘশিরস্ক নর্ডিক নরগোষ্ঠীর লোক। এরা ছিল বলিষ্ঠ, গৌরবর্ণ ও দীর্ঘকায়, মাথা বেশি লম্বা, নাক খুব সরু ও লম্বা এবং দৈহিক ওজন বেশ ভারী। ভারতের জনসমাজের মধ্যে নর্ডিক উপাদান পূর্বদিকে বারাণসী পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। আর পূর্বদিকে বাঙলাদেশ পর্যন্ত আলপীয় উপাদানই বেশি ; এছাড়া, পশ্চিম ভারতেও এদের দেখতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য যে আলপীয়রা নর্ডিকদের আগেই ভারতে এসেছিল। (লেখকের 'বাঙলার সামাজিক ইতিহাস,' পৃষ্ঠা ১২-১৩ দ্রঃ)। প্রাচীন সাহিত্যে এদের 'অসুর' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

ভূমধ্যসাগরীয় দ্রাবিড় ভাষাভাষী লোকদের আকৃতি ছিল মধ্যমাকার। এদের মাথা লম্বা, গড়ন পাতলা, নাক ছোট ও রঙ ময়লা। এরা বহির্বাণিজ্য উপলক্ষে দেশবিদেশে ভ্রমণ করত। বৈদিক সাহিত্যে উক্ত 'পণি'রা এই গোষ্ঠীর লোক ছিল। আদি মিশরীয়দের সঙ্গে এদের বেশি মিল আছে। আদিতান্নালুর অঞ্চলে প্রাপ্ত সমাধিপাত্রে ও দক্ষিণ ভারতের সমাধিস্তূপগুলিতে যে সকল নরকঙ্কাল পাওয়া গেছে, তাদের অধিকাংশই ভূমধ্যসাগরীয় নরগোষ্ঠীর লোকের।

দেশজ প্রটো-অস্ট্রালয়েড জাতির লোকেরা ছিল খর্বকায়। তাদের মাথার খুলি লম্বা থেকে মাঝারী, নাক চওড়া ও চ্যাপ্টা, গায়ের রঙ কালো ও মাথার চুল ঢেউ-খেলানো। এরা বর্তমান আদিবাসীদের পূর্বপুরুষ। প্রাচীন সাহিত্যে এদের 'নিষাদ' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এছাড়া ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে মংগোলয়েড বা 'কিরাত' জাতি।

বর্ণ শব্দের অর্থ হচ্ছে 'রঙ'। আমার মনে হয় যে আর্যরা নিজেদের ও এই তিন বিভিন্ন বর্ণ-বিশিষ্ট নরগোষ্ঠীকে অবলম্বন করেই চতুর্বর্ণের সৃষ্টি করেছিল। তারা নিজেদের ব্রাহ্মণ

বলে অভিহিত করেছিল যথাক্রমে আলপীয়দের নাম দিয়েছিল ক্ষত্রিয়, দ্রাবিড়-ভাষাভাষী 'পণি'দের বৈশ্য ও দেশজ প্রটো-অস্ট্রালয়েডদের শূদ্র। এর সমর্থন আমরা পরবর্তীকালের জনবিন্যাস থেকেও পাই। উত্তর ভারতের নর্ডিক নরগোষ্ঠী অধ্যুষিত বৈদিক ব্রাহ্মণরাই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলে পরিগণিত হত। এটা বাঙলার আদিশূর সম্পর্কিত কিংবদন্তি থেকে প্রমাণিত হয়।

আর পূর্ব ভারতের আলপীয় নরগোষ্ঠীরাই যে আদি ক্ষত্রিয় ছিল, তার প্রমাণ আমরা পাণিনীর 'কাশিকা' টীকার এক উক্তি থেকে পাই। পাণিনী বলেছেন যে ভরত-বংশীয়রা পূর্ব ভারতের লোক ছিল।

সকলেরই জানা আছে যে ক্ষত্রিয়দের মধ্যে ভরত-বংশীয়রাই শ্রেষ্ঠ ছিল। যদিও আর্যব্রাহ্মণরা কিছুদিন যাবৎ তাদের নিজেদের নাম অনুযায়ী এদেশের নাম আর্যাবর্ত, ব্রহ্মাবর্ত ইত্যাদি রাখবার চেষ্টা করেছিল, তা হলেও শেষ পর্যন্ত ক্ষত্রিয় ভরত-বংশীয়দের নাম অনুযায়ীই এদেশের নাম 'ভারতবর্ষ' হয়েছিল। মনে হয় এই নিয়ে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে একটা বিরোধ ঘটেছিল, যার আভাস আমরা বিশ্বামিত্র-বশিষ্ঠ উপাখ্যান থেকে পাই। পরশুরাম উপাখ্যানও এ সম্বন্ধে ইঙ্গিত করে।

আর দ্রাবিড়-ভাষাভাষী ভূমধ্যসাগরীয় পণিরাই ('পণি' শব্দ থেকে 'পণ', 'পণ্য', 'বণিক' প্রভৃতি শব্দ উদ্ভূত হয়েছে) ছিল বৈশ্য, যাদের প্রধান বৃত্তি ছিল বাণিজ্য। আর দেশজ অস্ট্রালয়েডরা হয়েছিল শূদ্র, যাদের বৃত্তি ছিল অপর তিন বর্ণের সেবা করা। তার মানে, তারাই ছিল সে যুগের 'শ্রমিক শ্রেণী' (আমার 'ডিনামিকস্ অব সিনথেসিস ইন হিন্দু কালচার' ও 'হিস্টরী অ্যান্ড কালচার অব বেঙ্গল' দেখুন)।

মনে হয় বর্ণবিভাগের কল্পনাটা আর্যরা প্রাগার্যদের কাছ থেকে নিয়েছিল, কেননা, মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা প্রভৃতি স্থানের নগরনির্মাণ বিন্যাস থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে সেখানেও একটা শ্রেণী-বিভাগ ছিল (লেখকের 'সিন্ধু সভ্যতার স্বরূপ ও অবদান' ৬৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। অন্যত্র আমি দেখিয়েছি যে গোত্রবিভাগও আর্যরা অনার্যদের exogamous (বহির্বিবাহ) 'টটেম' ও 'গোত' কল্পনা থেকে গ্রহণ করেছিল। এখানে বলা দরকার যে গোত্রবিভাগটা বৈদিকযুগের একেবারে অন্তিমকালে অথর্ববেদের যুগে প্রথম অবলম্বিত হয়েছিল।

বর্তমানে 'জাতি' বলতে আমরা দুটো জিনিস বুঝি। প্রথম, জাতক যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, সেই পরিবার যে জাতিভুক্ত, জাতকও সেই জাতিভুক্ত হয়। দ্বিতীয়, জাতককে নিজ জাতির মধ্যেই বিবাহ করতে হয়। তার মানে বংশানুক্রমে জাতকের জাতির আর কোন পরিবর্তন ঘটে না। চতুর্বর্ণ প্রথা যখন প্রথম অবলম্বিত হয়, তখন এটা ছিল না। বর্ণ সম্বন্ধে তখন একটা সামাজিক সচলতা (social mobility) ছিল। এক বর্ণের লোক অপর বর্ণে উন্নীত হতে পারত।

বিশ্বামিত্র ঋষি ক্ষত্রিয় থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন (যদিও তাঁর বৃত্তির কোন পরিবর্তন হয়নি)। এই নিয়ে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের মধ্যে যে সংঘর্ষ হয়েছিল, সে কাহিনী থেকে এটা পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়। তাছাড়া, এ কাহিনী থেকে জানতে পারা যায় যে ক্ষত্রিয়দের পুরোহিত ক্ষত্রিয়ই হতেন। যেমন, বর্তমানে ডোমদের পুরোহিত ডোমই হয়। আমাদের এই ধারণা যদি সত্য হয়, তাহলে বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র কাহিনী নর্ডিক আর্যগণের সহিত আলপীয় আর্যদের বিরোধ ইঙ্গিত করে। মনে হয় কুরু-পাঞ্চাল দেশে যখন এই দুই নরগোষ্ঠীর মধ্যে সাংস্কৃতিক সংশ্লেষণ ঘটেছিল, তখনই বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণত্ব দেওয়া হয়েছিল, এবং বিশ্বামিত্র রচিত মন্ত্রগুলি ঋগ্বেদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এটা অসম্ভব নয়, কেননা পণ্ডিতগণ মনে করেন যে ঋগ্বেদের মন্ত্রসমূহের বিভিন্ন কাল-স্তর আছে।

যাই হোক, চতুর্বর্ণের বর্ণসমূহ প্রথমে কঠোর নিয়মানুবর্তিতাসম্পন্ন অন্তর্বিবাহের গোষ্ঠী

(rigid endogamous groups) ছিল না। এটা অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহপ্রথা থেকে বুঝতে পারা যায়। অনুলোম বিবাহ ছিল উচ্চবর্ণ পুরুষের সহিত নিম্নবর্ণা কন্যার পরিণয়। আর, প্রতিলোম বিবাহ ছিল নিম্নবর্ণের পুরুষের সঙ্গে উচ্চবর্ণের নারীর বিবাহ। এই দুই বিবাহের ফসল ছিল সঙ্কর জাতি। তবে সঙ্কর জাতিগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে ধর্মশাস্ত্রকারগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। (আমার 'বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' দেখুন)।

একেবারে সূচনায় বাঙলার সমাজ সংগঠন আর্যসমাজ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। এটা সকলেরই জানা আছে যে ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুপ্রবেশ বাঙলাদেশে খুব বিলম্বে ঘটেছিল। সেজন্য ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুপ্রবেশের পূর্বে বাঙলায় চাতুর্বর্ণ্য সমাজ ছিল না। ছিল কৌমসমাজ ও বিভিন্ন বৃত্তিধারী জাতিগোষ্ঠীর সমাজ। তারপর যে সমাজের উদ্ভব ঘটেছিল, তাতে জাতিভেদ ছিল না, ছিল পদাধিকারঘটিত বৃত্তিভেদ। এটা আমরা জানতে পারি সমসাময়িক তাম্রপট্টে উল্লিখিত 'প্রধান কায়স্থ', 'জ্যেষ্ঠ কায়স্থ', 'প্রতিবেশী', 'কুটুম্ব' প্রভৃতি নাম থেকে। তারপর পাই বৃত্তিধারী গোষ্ঠীর নাম, যথা 'নগরশ্রেষ্ঠী', 'সার্থবাহ', 'ক্ষেত্রকার', 'ব্যাপারি' ইত্যাদি। পরে পালযুগে যখন রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য ঘটে, তখন বাঙলার বৃত্তিধারীগোষ্ঠীগুলি আর বৈবাহিক আদান-প্রদানের নিমিত্ত স্বতন্ত্র সংস্থা হিসাবে কার্যকর থাকেনি। বৃত্তিধারী জাতিনির্বিশেষে তখন বিবাহ হতে থাকে। তখনই বাঙলার জাতিসমূহ সঙ্করত্ব প্রাপ্ত হয়। সুতরাং পালরাজগণের পরে সেনরাজাদের আমলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের যখন পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটে, তখন বাঙলার সকল জাতিই সঙ্করত্ব দোষে দুষ্ট। সেজন্য 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ'-এ বাঙলার সকল জাতিকেই সঙ্কর জাতি বলে অভিহিত করা হয়। তবে তাদের তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, যথা (১) উত্তম সঙ্কর, (২) মধ্যম সঙ্কর ও (৩) অন্ত্যজ। এরপর আরও একটা শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছিল—নবশাখ বিভাগ। নবশাখ মানে যাদের হাতে ব্রাহ্মণরা জলগ্রহণ করত। এ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণের জন্য লেখকের 'বাঙলার সামাজিক ইতিহাস', পৃষ্ঠা ৩৭-৪৪ দ্রষ্টব্য।

বিবাহের অন্তর্গোষ্ঠী হিসাবে মধ্যযুগে যে সকল জাতি বিদ্যমান ছিল, তাদের নাম আমরা মঙ্গলকাব্যসমূহে পাই। ময়ূরভট্টের 'ধর্মপুরাণ'-এ যে তালিকা দেওয়া হয়েছে, তা এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে। 'সদ্‌গোপ কৈবর্ত আর গোয়ালা তাম্বুলী। / উগ্রক্ষেত্রী কুম্ভকার একাদশ তিলি॥ / যোগী ও আশ্বিন তাঁতি মালী মালাকার। /নাপিত রজক দুলে আর শঙ্খধর ॥ /হাড়ি মুচি ডোম কলু চণ্ডাল প্রভৃতি। /মাঝি বাগদী মেটে নাহি ভেদজাতি॥/ স্বর্ণকার সুবর্ণবণিক কর্মকার।/সূত্রধর গন্ধবেনে ধীবর পোদ্দার॥/ ক্ষত্রিয় বারুই বৈদ্য পোদ পাকমারা। /পরিল তামার বালা কায়স্থ কেওরা॥' (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৮২)।

বর্তমানে বাঙলাদেশে দুই শ্রেণীর জাতি আছে (১) তফসিলভুক্ত জাতি ও (২) বর্ণহিন্দু জাতি। মোট ৬৩টি তফসিলভুক্ত জাতি আছে। (সম্পূর্ণ তালিকার জন্য লেখকের 'বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়', পৃষ্ঠা ৫৭ দ্রষ্টব্য)। অনেকের ধারণা যে তফসিলভুক্ত জাতিরা সকলেই নীচু জাত। কিন্তু তা নয়। কেননা তফসিলভুক্ত জাতির তালিকায় আমরা ঝালোমালো, নট প্রভৃতি জাতির নাম পাই। মনুর 'মানবধর্মশাস্ত্র' অনুযায়ী (১০।২২) এরা সকলেই ব্রাত্যক্ষত্রিয় ও কারণ-দের (কায়স্থদের) সমান। তবে বাঙলার জাতিসমূহের মধ্যে বিংশ শতাব্দীতে একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। কায়স্থরা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলছে, বাগদীরাও নিজেদের বর্গক্ষত্রিয় বলছে, মেথররাও নিজেদের মলক্ষত্রিয় বলছে, পোদেরাও নিজেদের পুণ্ড্রক্ষত্রিয় বলছে। কিন্তু কেউই চিন্তা করে দেখছে না যে সকলেই যদি ক্ষত্রিয় হয়, তাহলে সমীকরণ করলে পরিস্থিতিটা কী দাঁড়ায় ? সেই পরিস্থিতির কথা বলেই এই প্রসঙ্গ শেষ করব। পরিস্থিতিটা নীচের সমীকরণে দেখানো হল :

কায়স্থ=বাগদী=মেথর=পোদ=ক্ষত্রিয়।

৯

মধ্যযুগে বাঙালি সমাজের বিবর্তন

১২০৩ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খিলজি বাঙলা জয় করে। তখন থেকেই মধ্যযুগের সূচনা হয়। মধ্যযুগে বাঙলার সমাজে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে। বিজয়ী মুসলমানরা বৌদ্ধ ও হিন্দু মঠ-মন্দিরসমূহ ধ্বংস করতে থাকে। বৌদ্ধ শ্রমণরা নেপাল ও তিব্বতে পালিয়ে যায়। হিন্দুরা এখানেই থাকে। মুসলমানরা হিন্দুদের জোর করে ধর্মান্তরিত করতে শুরু করে দেয়।

এক কথায় ইসলামের প্রতিঘাতে মধ্যযুগের বাঙালি সমাজ দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়—হিন্দু সমাজ ও মুসলমানসমাজ। হিন্দুসমাজ ছিল ব্রাহ্মণশাসিত সমাজ। এ সমাজের শীর্ষে ছিল বটুক ব্রাহ্মণ। আর তার তলায় ছিল বাকী সব জাত। বৃহদ্ধর্ম-পুরাণে এদের সকলকেই সঙ্কর জাতি বলা হয়েছে। এদেরও আবার উপবিভাগ ছিল—উত্তম সঙ্কর, মধ্যম সঙ্কর ও অন্ত্যজ। ইসলামের সাম্য নীতির দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে, এই অন্ত্যজ জাতিরাই বেশি পরিমাণে মুসলমান সমাজের পুষ্টিসাধন করেছিল।

বৃহদ্ধর্ম-পুরাণের সমাজকে অবলম্বন করেই মধ্যযুগে হিন্দুসমাজকে নতুন করে গড়া হয়। ব্রাহ্মণেতর জাতিভেদের কথাই প্রথম বলি। এদের দুভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল—জল আচরণীয় ও জল অনাচরণীয়। জল আচারণীয় মানে যাদের দেওয়া জল ব্রাহ্মণরা পান করতেন। নয়টা জাতকে জল আচরণীয় বলে চিহ্নিত করা হয়। এ নয়টি জাত হচ্ছে—তিলি, তাঁতি, মালাকার, সদ্‌গোপ, নাপিত, বারুই, কামার, কুম্ভকার, গন্ধবণিক ও ময়রা। এদের নবশাখ বলা হত। ব্রাহ্মণ সমাজও নতুনভাবে সংগঠিত হয়। কৌলীন্য প্রথার উদ্ভব ঘটে। বন্দ্যো, চট্ট, মুখটি, ঘোষাল, পুতিতণ্ডু, গাঙ্গুলী, কাঞ্জীলাল ও কুন্দলাল—এঁরা প্রধান বা মুখ্যকুলীন হিসাবে পরিগণিত হন। আর রাঢ়ী, গুড়, মাহিন্ত, কুলভী, চৌতখণ্ডি, পিপ্পলাই, গড়গড়ি, ঘণ্টাশ্বরী, কেশরকোনা, দিমপাই, পরিহল, হাড়, পিতমুণ্ডি ও দীর্ঘতি—এঁরা হন গৌণ কুলীন। বাকি ব্রাহ্মণরা শ্রোত্রিয় শ্রেণীভুক্ত হন। সঙ্গে সঙ্গে গাঁই প্রথারও প্রবর্তন ঘটে। রাঢ়ীয়দের ৫৫ গাঁই (মতান্তরে ৫২ বা ৫৯)। আর বারেন্দ্রদের ১০০ গাঁই। কিন্তু কিংবদন্তী অনুযায়ী বারেন্দ্রদের মাত্র পাঁচটি গাঁই, যথা লাহিড়ী, বাগচী, মৈত্র, সান্যাল ও ভাদুড়ী। এই পাঁচ গাঁইয়ের বারেন্দ্ররা কুলীন বলে স্বীকৃত হন। শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। যথা, সিদ্ধশ্রোত্রিয়, সাধ্যশ্রোত্রিয় ও কাষ্ঠশ্রোত্রিয়। রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ছাড়া আর যেসব ব্রাহ্মণদের সঙ্গে মধ্যযুগের বাঙালি সমাজের আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে, তারা হচ্ছে বৈদিক, দাক্ষিণাত্য, শাকদ্বীপি প্রভৃতি। প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলা যেতে পারে যে, মধ্যযুগের কায়স্থ ও সদ্‌গোপ সমাজেও কৌলীন্যপ্রথা অনুসৃত হতে দেখা যায়। মধ্যযুগের সমাজে যবনদোষের জন্য অনেকে জাত হারান। যারা যবনদের সংস্পর্শে আসত, তাদেরই যবনদোষ ঘটত। যবনদোষ তখনই ঘটত যখন হিন্দু নারী মুসলমান, মগ ও পোর্তুগীজগণকর্তৃক ধর্ষিতা হত, বা পুরুষরা তাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করত। গোড়ার দিকে সমাজের বিধানকর্তারা কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করে যবনদোষদুষ্ট পরিবারদের জাতিচ্যুত করত। কিন্তু পরে যখন দেখা গেল যে, ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাচ্ছে, তখন তারা শাস্তিটাকে লঘু করেছিল। অন্তত দেবীবরের মেলবন্ধন সেই সাক্ষ্যই বহন করে। হিন্দুসমাজের মধ্যে পিরালী, শেরখানী প্রভৃতির সৃষ্টি এইভাবেই হয়েছিল। সমাজের মধ্যে পিরালীদের একটা স্থান ছিল বটে, কিন্তু অন্য ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তাদের বৈবাহিক কার্যাদি হত না। সেজন্যই আমরা

পরবর্তীকালে পিরালী গোষ্ঠীভুক্ত জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির কর্তাদের দেখি আড়কাটি হিসাবে বাড়ির দাসীদের পাঠাতে যশোহর থেকে মেয়ে সংগ্রহ করতে, ছেলেদের বিবাহের জন্য। অপরপক্ষে, ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের বিয়ে করলে পাত্রকে জাতিভ্রষ্ট হতে হত। এই বিপদটা ওঁদের কেটে যায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্ম হবার পর। যে সকল জাতি নিয়ে মধ্যযুগের সমাজ সংগঠিত ছিল, তাদের সকলেরই এক একটা বিশেষ কৌলিক বৃত্তি ছিল। যুগ যুগ ধরে বংশপরম্পরায় তারা এইসব বৃত্তিসম্পর্কিত টেকনোলজির ধারক ছিল। এমন কি, হিন্দু যখন মুসলমান হয়ে যেত, তখন সে তার কৌলিক বৃত্তি পরিহার করত না। তাছাড়া, তারা হিন্দুর পালাপার্বণে যোগ দিত ও ছেলেমেয়েদের বিবাহের সময় হিন্দুর পঞ্জিকা অনুসরণ করত।

এবার মধ্যযুগের ধর্মীয় ক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছিল, সে সম্বন্ধে কিছু বলি। মুসলমান আক্রমণের ফলে ধর্মীয় ক্ষেত্রে এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছিল। তখন তন্ত্রধর্মেরই প্রাধান্য ছিল। সাধনার জন্য তান্ত্রিক সাধকরা পঞ্চ-মকার পদ্ধতি অনুসরণ করত। মৈথুন তার অন্যতম এবং এর জন্য প্রয়োজন হত পরস্ত্রী। এর ফলে সমাজের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছিল। এই পরিস্থিতি আরও শৈথিল্য লাভ করে, মুসলমানরাজগণের আমলে। এই বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে অভ্যুত্থান ঘটে অনেক লোকায়ত দেবদেবীর। পূর্বে এই সকল দেবদেবী সমাজের নিম্নকোটির লোকগণ কর্তৃক পূজিত হতেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন মনসা, চণ্ডী, বাসুলী, শীতলা প্রভৃতি। মধ্যযুগে যখন ব্রাহ্মণ্যধর্মের ভিত্তি টলমল করে ওঠে, তখন এই সকল দেবদেবী তাঁদের পর্বতকন্দর, ঝোপজঙ্গল বা গাছতলার আশ্রয় পরিহার করে ক্রমশ হিন্দুর আনুষ্ঠানিক ধর্মসংস্কারের মধ্যে প্রবেশলাভ করতে থাকেন। এই অনুপ্রবেশকে সহজ করবার জন্য তাঁদের পৌরাণিক মাতৃদেবীর সঙ্গে অভিন্ন প্রতিপন্ন করা হয়। এই সকল দেবদেবীর মহিমা প্রচারের জন্য সঙ্গে সঙ্গে এক বিরাট সাহিত্য গড়ে ওঠে। এ সাহিত্য চার শ্রেণীতে বিভক্ত—মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ও শিবায়ন। রাতের পর রাত গ্রামাঞ্চলে এগুলি আশমানের চাঁদোয়ার তলায় পাঁচালী (বা পাঞ্চালিকা) হিসাবে গীত হত।

এছাড়া মধ্যযুগে ইসলামধর্মের সংস্পর্শে এসে এবং তার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে হিন্দুসমাজে আরও অনেক দেবদেবী আবির্ভূত হন। তাঁদের অন্যতম হচ্ছেন সত্যপীর, গাজীসাহেব, বনবিবি প্রভৃতি। এর মধ্যে সত্যপীরের পূজা বিশেষ ব্যাপকতা লাভ করে। সত্যপীরের পূজা-কথায় বলা হয় যে, সত্যপীর ও নারায়ণ অভিন্ন। সেজন্য সত্যপীর বর্তমানে সত্যনারায়ণ নামে পূজিত হন।

মধ্যযুগে এইসকল যুক্তসাধনামূলক গণতান্ত্রিক দেবদেবীর পূজার উদ্ভবের ফলে হিন্দুসমাজ মুসলমান কর্তৃক ধর্মান্তরকরণের ফলে যে ভাঙনের সম্মুখীন হয়েছিল তা থেকে রেহাই পায়। এই যুক্তসাধনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অবদান ছিল মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের। শ্রীচৈতন্য তাঁর ধর্মসমাচার জাতি ও সম্প্রদায়নির্বিশেষে সর্বমানবের উদ্দেশে প্রচার করেন। জনতাকে এ ধর্ম বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে ও তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অনেক মুসলমান ছিল। মুসলিম সাহিত্যক্ষেত্রেও চৈতন্য-প্রবর্তিত ধর্ম বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। চৈতন্যের অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করেন আউলচাঁদ ও তাঁর শিষ্য রামশরণ পাল। তাঁরা যে ধর্ম প্রবর্তিত করেন তা সত্যধর্ম বা সতীমার ধর্ম নামে ঘোষপাড়ায় প্রচলিত। এখানে হিন্দু-মুসলমান একত্রে উপাসনা ও খাওয়া-দাওয়া করে।

এরপর বাঙালি সমাজে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে যখন বাঙালি সমাজ বিদেশী ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে আসে। প্রথম আসে পোর্তুগীজরা ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে। এটা ছিল শ্রীচৈতন্যদেব ও

স্মার্ত রঘুনন্দনের সমসাময়িককাল। চৈতন্যদেব যেমন বাঙালি সমাজে জাতিভেদ প্রথা বিলোপের চেষ্টা করেছিলেন, রঘুনন্দন তেমনই অপহৃতা ও পদস্খলিতা নারীকে অল্প প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা হিন্দুসমাজে আবার গ্রহণ করবার বিধান দেন। তার মানে, হিন্দু সমাজের বিধিনিষেধের কঠোরতা ক্রমশ কমে যাচ্ছিল। ফলে পোর্তুগীজরা যখন এদেশে আসে, বাঙালিরা তখন তাদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করেছিল। বণিকসমাজ তাদের সঙ্গে বাণিজ্য করে ধনশালী হয়েছিল। বাঙালি মেয়েরা পোর্তুগীজদের অঙ্কশায়িনী হতে কুণ্ঠা বোধ করেনি। অনেক কৃষি ফসলের চাষ পোর্তুগীজরা শুরু করে দিয়েছিল, যথা, আলু, তামাক, সাগু, কাজুবাদাম, আনারস, আতা, আমড়া, পেঁপে, পেয়ারা ও লেবু। এই কৃষি-বাণিজ্য ও যৌনমিলনের ফলে বহু পোর্তুগীজ শব্দ বাংলা ভাষার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, যথা, আচার, আমড়া, আয়া, আলমিরা, আনারস, আরক, বালতি, ভাঙা, বাট্টা, বৃঞ্জল, বুটিক, কাজু, কামরা, কামিজ, চাবি, কোকো, গুদাম, গির্জা, ঝিলমিলি, লস্কর, নিলাম, মিস্ত্রি, পাদবি, পালকী, পমফ্রেট, পেঁপে, পিওন, রসিদ, সাগু, বারান্ডা, কাবাব, আলকাতরা, আতা, বাসন, ভাপ, বজরা, বিস্কুট, বয়া, বোতাম, বোতল, কেদারা, কাফ্রি, কাকাতুয়া, কামান, ছাপ, কৌচ, কম্পাস, খ্রিস্টান, ইস্পাত, ইস্ত্রি, ফিতা, ফর্মা, গরাদ, জোলাপ, জানালা, লানটার্ন, লেবু, মাস্তুল, মেজ, পেয়ারা, পিপা, পিরিচ, পিস্তল, পেরেক, রেস্ত, সাবান, তামাক, টোকা, তুফান, তোয়ালে, বরগা, বেহালা ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এসব জিনিসের ব্যবহার পোর্তুগীজদের প্রভাবেই বাঙালি সমাজে প্রবেশ করেছে।

পোর্তুগীজদের একশো বছর পরে ইংরেজরা এদেশে আসে। তাদের আমলেই এদেশে মধ্যবিত্ত সমাজের সৃষ্টি হয় ও বহু ইংরেজি শব্দ বাংলা ভাষার অন্তর্ভুক্ত হয়। তাছাড়া তাদের দ্বারা প্রবর্তিত বাংলা মুদ্রণ এ দেশের সমাজে এক বৈপ্লবিক বিস্ফোরণ ঘটায়। যাঁরা বাঙালি সমাজ সম্বন্ধে বিশদভাবে জানতে চান তাঁরা আমার রচিত 'বাঙলার সামাজিক ইতিহাস' বইখানি পড়ে নিতে পারেন।

বাঙালি সমাজের লুপ্ত বিবাহ

'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান/ শিব ঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যা দান।' এটা একটা শিশুশুলভ ছড়া; এর মধ্যে কোন সুসংলগ্ন চিন্তাধারা নেই। বৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে নদীতে বান আসার একটা যুক্তিপূর্ণ সম্বন্ধ আছে বটে, কিন্তু তার সঙ্গে শিবঠাকুরের একসঙ্গে তিন কন্যার বিয়ের সম্পর্কটা কোথায়? আমার মনে হয় এটা বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের একটা লুপ্ত প্রথা মাত্র উদ্ধৃত ছড়া থেকেই আমরা তিন কন্যা দানের কথা জানতে পারি না। 'ময়নামতীর গান'-এও আমরা পড়ি যে রাজা হরিশচন্দ্র যখন রাজা গোপীচন্দ্রের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিবাহ দিয়েছিলেন, তখন তিনি 'অদুনার বিয়া দিয়া পদুনা করিল দান' 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের নায়কও একসঙ্গে দুই বোনকে বিবাহ করেছিলেন।

মনে হয় কোন এক সুপ্রাচীন কালে বাঙালি সমাজে একই পাত্রের সঙ্গে সকল কন্যার বিবাহ দেওয়ার রীতি ছিল। এরূপ রীতিকে নৃতত্ত্বের ভাষায় 'শালীবরণ' বলা হয়। বাঙালি সমাজের এই রীতি সম্বন্ধে আমি ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে 'ম্যান ইন ইন্ডিয়া' পত্রিকায় (বর্তমানে ভারত সরকারের নৃতত্ত্ব সমীক্ষা বিভাগের মুখপত্র) বিশদ আলোচনা করেছিলাম। তখন আমি আরও বলেছিলাম যে, বাঙালি সমাজে শুধু 'শালীবরণ' নয়, 'দেবরণ' প্রথাও এক সময় প্রচলিত ছিল। আমার এই মতবাদের সপক্ষে আমি বাঙালি সমাজে বর্তমানে প্রচলিত বিবাহের সময় অনুসৃত কতকগুলি রীতির উল্লেখ করেছিলাম। এই রীতিগুলি খুবই অর্থব্যঞ্জক।

'শালীবরণ'-এর সপক্ষে যে রীতির উল্লেখ করেছিলাম, তা হচ্ছে মেয়ের বিবাহের সময় 'জামাইবরণ' প্রথা। প্রথমেই বলে নিতে চাই 'শালীবরণ' কি। শালীবরণ প্রথাটা পৃথিবীর নানা আদিম সমাজে প্রচলিত আছে। এটা হচ্ছে—যদি কোন পুরুষ কোন মেয়েকে বিবাহ করতে চায়, তা হলে ওই বিবাহের সঙ্গে তার বিধিবদ্ধ মৌলিক অধিকার থাকে ওই মেয়ের অন্যান্য কনিষ্ঠা বোনদেরও বিবাহ করবার। তার মানে 'ক' যদি 'খ'-কে বিবাহ করে, তা হলে তার ওই মৌলিক অধিকার অনুযায়ী সে 'খ'-এর অন্যান্য ছোট বোনদেরও বিবাহসূত্রে উপহার পায়। বাঙলার প্রাচীন গীতিকাব্য 'ময়নামতীর গান'-এ উল্লিখিত 'অদুনার বিয়া দিয়া পদুনা করিল দান', তারই প্রতিধ্বনি করছে। অতীতের কোন এককালে আর্থিক বা সামাজিক কোন কারণে এই প্রথা রহিত হয়েছিল। তখন প্রশ্ন উঠেছিল, পাত্র যখন শালীদের ওপর তার অধিকার ছেড়ে দিচ্ছে, তখন তাকে কী ভাবে প্রীত করা যেতে পারে? তখনকার দিনে তাকে প্রীত করবার জন্য কী প্রতিদানের ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হয়েছিল, জনি না। তবে বর্তমানে প্রচলিত 'জামাইবরণ' প্রথা যে তার লুপ্তস্মৃতি বহন করছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

'জামাইবরণ'টা কি? এটা সকলেরই জানা আছে যে বিবাহের পূর্বমুহূর্তে জ্যেষ্ঠ জামাই বা জামাইদের বস্ত্র প্রভৃতি দ্বারা প্রীত না করলে, কনিষ্ঠা শালীর পাণিপ্রার্থী কোন বরই বিবাহে বসতে পারে না। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যাবে যে জ্যেষ্ঠ জামাইকে প্রীত করবার কারণ কি? এবং তাকে প্রীত না করলে কনিষ্ঠা শালীর বিবাহই বা হতে পারে না কেন? তার যে কোন অধিকার ছিল, এবং তাকে তার সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে বলেই, তাকে প্রীত করা হচ্ছে, এটাই হচ্ছে, 'জামাইবরণএ'র স্বাভাবিক ব্যাখ্যা। সে অধিকারটা যে শালীবরণের অধিকার সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আরও একটা কথা আছে।

জ্যেষ্ঠ জামাইদের শালীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সঙ্গে ঠাট্টা-তামাসা করবার যে সামাজিক এবং লৌকিক অধিকার আছে, তা-ও সেই লুপ্ত শালীবরণ প্রথারই স্মৃতিচিহ্ন।

অনুরূপভাবে বাঙালি সমাজে এক সময় 'দেবরণ' প্রথাও প্রচলিত ছিল। দেবরণ হচ্ছে শালীবরণের বিপরীত প্রথা। শালীবরণে স্ত্রীর কনিষ্ঠা ভগিনীদের ওপর জ্যেষ্ঠ ভগিনীপতির যৌন অধিকার থাকে। আর দেবরণ-এ জ্যেষ্ঠা ভাবীর ওপর দেবরের অধিকার। এ প্রথা এখনও বাঙলার সাঁওতাল সমাজে ও ওড়িশার নিম্নজাতিদের মধ্যে প্রচলিত আছে। বর্তমান বাঙালির বিবাহ প্রথার মধ্যেও এর নিদর্শন আছে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যখন বিবাহ করে নববধূকে নিয়ে গৃহে ফিরে আসে, তখন কনিষ্ঠ ভ্রাতা তার পথ রোধ করে, তাকে প্রশ্ন করে—'দাদা, আমার বিয়ে দিবে তো?' জ্যেষ্ঠ সম্মতি জ্ঞাপন করলে, তবেই নববধূকে নিয়ে জ্যেষ্ঠ গৃহে প্রবেশ করতে পারে। এটাও কনিষ্ঠের অধিকার সমর্পণ করার নিদর্শন। ভাবীর সঙ্গে কনিষ্ঠ দেবরের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তা-ও কোন এক সুদূর প্রাচীনকালে বাঙালি সমাজে 'দেবরণ' প্রথা প্রচলনের লুপ্ত চিহ্ন মাত্র। এটাই এর নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা (যাঁরা এসব বিষয়ে বেশি কিছু জানতে আগ্রহী, তাঁরা আমার 'ভারতে বিবাহের ইতিহাস', 'Dynamics of Synthesis in Hindu Culture' ও 'Sex & Mrriage in India' বইগুলি পড়তে পারেন।)

অবৈধ সন্তানের সামাজিক স্বীকৃতি

সকল দেশেই সকল যুগে অবৈধ সন্তানের আবির্ভাব ঘটেছে। অবৈধ সন্তান বলতে আমরা সেই সন্তানকে বুঝি যার মায়ের পরিচয় আছে, পিতার স্বীকৃত পরিচয় নেই। পুরুষের প্রলোভন ও নারীর দেহধর্মের দুর্বলতার সংগঠনে যে সন্তান জন্মায়, তাকেই অবৈধ সন্তান বলা হয়। অবৈধ সন্তান হচ্ছে অবজ্ঞার পাত্র।

ঋগ্বেদের আমল থেকেই আমাদের দেশে অবৈধ সন্তানের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। তবে তাদের নামধাম সর্বক্ষেত্রে উল্লিখিত হয়নি। নামধামবিশিষ্ট এক অবৈধ সন্তানের উল্লেখ ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের ৫৬ সূক্তের ২১ ঋকে আছে। নাম তাঁর পৃথুশ্রবা। দ্বিতীয় উল্লেখ পাই ছান্দোগ্য উপনিষদে। নাম তাঁর জাবালি সত্যকাম। তিনিই প্রথম বুদ্ধিজীবী অবৈধ সন্তান যিনি গৌতম ঋষির কাছ থেকে সামাজিক স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে জাবালি সত্যকাম মহর্ষির মর্যাদা লাভ করেছিলেন। বুদ্ধিজীবী জগতে আমরা যে দ্বিতীয় অবৈধ সন্তানের উল্লেখ পাই, তিনি হলেন মহাভারতে বর্ণিত ধীবরকন্যা মৎস্যগন্ধার অবৈধ সন্তান। ধীবরকন্যা মৎস্যগন্ধা যমুনায় নৌকা পারাপারের কাজে নিযুক্ত ছিল। একদিন তীর্থযাত্রাকালে পরাশর ঋষি নদী পার হবার জন্য মৎস্যগন্ধার নৌকায় ওঠেন। তিনি মৎস্যগন্ধার অপরূপ রূপলাবণ্যে কামমোহিত হয়ে তার সঙ্গম প্রার্থনা করেন। মৎস্যগন্ধা বলে—'নৌকার ওপর উভয় তীরের লোক ও ঋষিদের সামনে এরূপ সঙ্গম সম্ভবপর নয়।' তখন পরাশর চারিদিকে কুয়াশা সৃষ্টি করে মৎস্যগন্ধার সঙ্গে রমণে প্রবৃত্ত হন। এই সঙ্গমের ফলেই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের জন্ম হয়—যিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন বেদসংকলন, মহাভারত রচনা ও আঠারোখানা পুরাণ ও আঠারোখানা উপপুরাণ রচনার জন্য। কিন্তু আবার মহাভারতেই আমরা দেখতে পাই যে অবৈধ সন্তানকে সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে না। যাঁকে দেওয়া হয়নি, তিনি হচ্ছেন কুন্তির কানীন পুত্র কর্ণ। ঘটনাটি ঘটেছিল দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায়। লক্ষ্যভেদের জন্য কর্ণ যখন ধনু উত্তোলন করেন, দ্রৌপদী তখন তাঁকে বরণ করতে অসম্মত হন। অবশ্য সেখানে দৌপদী কর্ণকে 'সূতপুত্র' বলে অভিহিত করেছিল।

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে, অবৈধ সন্তানের মাতা হলেও মৎস্যগন্ধা ও কুন্তি উভয়েই সামাজিক মর্যাদা পেয়েছিল। উভয়েরই রাজারাজড়ার ঘরে বিবাহ হয়েছিল। মৎসগন্ধার বিবাহ হয়েছিল হস্তিনাপুরের রাজা শান্তনুর সঙ্গে। কুন্তির বিবাহ হয়েছিল পাণ্ডুর সঙ্গে। তাছাড়া পঞ্চকন্যার অন্যতমা হয়ে আজও তিনি নিত্যস্মরণীয়া হয়ে আছেন।

মনুসংহিতায় ক্ষেত্রজ সন্তানের উত্তরাধিকার আছে, কিন্তু অবৈধ সন্তান সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নেই। তবে সেকালে হাট থেকে দাসদাসী কেনার প্রচলন ছিল। মধ্যযুগে এ প্রথা বিশেষ প্রসার লাভ করে। অনেকে যৌনলিপ্সা চরিতার্থ করবার জন্য দাসীদের ব্যবহার করত। এরূপ দাসীদের গর্ভজাত সন্তানদের উত্তরাধিকার সম্পর্কে পরবর্তীকালের স্মৃতিসমূহে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

এদেশে বিদেশীয়দের আগমনের পর অবৈধ সন্তানের সংখ্যা খুবই বৃদ্ধি পেয়েছিল। ধর্মান্তরিত অবৈধ সন্তানরা অনেকেই ট্যাশ-ফিরিঙ্গীর দলে মিশে গিয়েছিল। এক এদেশী রমণীর সঙ্গে কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা জোব চার্নক প্রায় বিশ বছর স্বামী-স্ত্রীরূপে বসবাস করেছিলেন।

আনুষ্ঠানিকভাবে যে তাঁদের বিয়ে হয়েছিল তার কোন প্রমাণ নেই। তাঁদের তিন মেয়ে ছিল। কিন্তু সাহেবী সমাজে তারা স্বীকৃতি লাভ করেছিল। একজনের বিবাহ হয়েছিল গভর্নর চার্লস আয়ারের সঙ্গে, আর একজনের উইলিয়াম বাউরিজের সঙ্গে এবং আর একজনের জোনাথান হোয়াইটের সঙ্গে! এঁরা সকলেই প্রভাবশালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন।

গত শতাব্দীতে কলকাতার হিন্দুসমাজে দুই সন্তানকে নিয়ে রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে রাজারাম, যাকে রাজা রামমোহন রায় পুত্র হিসাবে মানুষ করেছিলেন। তাঁর এক যবনী রক্ষিতার কথা সকলেরই জানা আছে। এ সম্বন্ধে ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের ৪ নভেম্বর তারিখের 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় 'দ্বিজরামের খেদোক্তি' কবিতায় নিম্নলিখিতরূপে উল্লেখ আছে:

'যবনী প্রেয়সী গর্ভে সুপুত্র জন্মিল।
রাজা নাম দিনু তার নিকটে রহিল।'

দ্বিতীয় গোলমাল হয়েছিল যখন তৎকালীন বিখ্যাত নতর্কী হীরা বুলবুলের ছেলেকে হিন্দু স্কুলে ভর্তি করা হয়। 'বেশ্যানন্দন'-এর এই ভর্তির ব্যাপার নিয়ে কলকাতার রক্ষণশীল সমাজ ভীষণ হৈচৈ করেছিল, এবং অনেকেই তাদের ছেলেদের হিন্দু স্কুল থেকে নাম কাটিয়ে অন্যত্র ভর্তি করেছিল।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এদেশের লোক বেশ উদার মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়ে। বর্তমান লেখকের জানা বহু অবৈধ সন্তান (মেয়ে ও পুরুষ উভয়ই) আছেন যাঁরা সাহিত্য, সঙ্গীত, অভিনয় ও ব্যবসাক্ষেত্রে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন এবং নিজ সন্তানদের ভাল ভাল ঘরে বিবাহ দিয়ে নিজেদের কালিমা সন্তানদের ললাট থেকে মোচন করেছেন।

১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় সংসদ বিবাহ সম্পর্কে যে সংশোধনী আইন প্রণয়ন করলেন, তাতে বলা হল যে হিন্দু বিবাহ আইনের ১৬ ধারায় ও স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্টের ২৬ ধারায় বিবৃত অসিদ্ধ ও বাতিলযোগ্য বিবাহকে আইনত সিদ্ধবিবাহ বলে ধরে নিয়ে, তাদের সন্তানকে বৈধ সন্তান বলে গণ্য করা হবে। এ আইন দ্বারা মাত্র সন্তানকেই বৈধ করা হয়েছে, তার পিতামাতার বিবাহকে বৈধ করা হয়নি। আরও একটা কথা। এ আইনে কানীন সন্তানকে স্পষ্টত কোন বৈধতা দেওয়া হয়নি। বিলাতের আইনে কিন্তু কানীন সন্তানকে সামাজিক মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, যদি ওই সন্তানের পিতামাতা সন্তান জন্মের পরে বৈধভাবে বিবাহিতা হয়। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে ১ জানুয়ারি থেকে সেখানে এই আইন বলবৎ আছে। বর্তমানে ভারতের হাসপাতালসমূহে প্রতি বৎসর ১২ লক্ষ অবৈধ সন্তানের জন্ম হয়। বলা বাহুল্য, এর মধ্যে বেশ কিছু মোটা সংখ্যক হচ্ছে কানীন সন্তান। তাদের বৈধতা দেবার জন্য বিলাতের অনুরূপ আইন এখানেও প্রণীত হওয়া উচিত। এটা যে একটা বড় নৃতাত্ত্বিক সমস্যা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

—

গ্রন্থপঞ্জী

Anthropology

Boas, F.—General Anthropology.
Clodd—Animism & Fetishism.
Crawley—Mystic Rose.
Downie, E.A.—Anthologia Anthropologicea.
Enthoven—Indian Ethnography.
Frazer, J.G —The Golden Bough.
,, ,, —Totemism & Exogamy.
Hoebel, E.A.—Man in the Primitive World.
International Encyclopaedia of Social Sciences.
Kroeber, A.L.—Anthropology.
La Farge, O.—The Perfect Circle.
,, —Configuration of Culture Growth.
,, —Nature of Culture.
,, —The Style & Civilization.
Levi-Strauss, C. —Structural Anthropology.
,, —Man, Culture & Society.
,, —Totemism.
,, —Race & History.
,, —Today's Crisis in Anthropology.
Mallinowski, B.—A Scientific Theory of Culture.
Nesfield—Punjab Castes.
Risley, H.—People of India.
Rapport, S., & Wright, H.—Anthropology.

Mallinowski, B.—A Scientific Theory of Culture.
Nesfield—Punjab Castes.
Risley, H.—People of india.
Rapport, S., & Wright , H.—Anthropology.

Sur, A.K.—Bangalir Nritattvik Parichaya (in Bengali)
,, —Bharater Vivaher Itihasa (in Bengali)
,, —Banglar Samajik Itihasa (in Bengali)
,, —Sex & Marriage in India
Tylor—Anthropology.
Washburn, S.L.—Anthropology Today.

Hindu Civilization

Agambagish, K.—Tantrasara.
Allchin, B. & R.—The Birth of Indian Civilization.
Avalon, Arthur—Shiva & Shakti.
,, ,, —Kularnava Tantra.
Bakshi, M. J.—Saradatilak Tantra.
Basham, A.L.—Wonder that was India.
Basu, Nirmal Kumar—Hindu Samajer Garan (in Bengali)
Bharati, A.—Tantrik Tradition.
Bhattacharya, B. —Guhyasamaja Tantra.
—Bauddhader Devdevi (in Bengali)
Cambridge History of India.
Chakravarti, C.—Tantrakatha (in Bengali)
Chatterjee, J. C.—Kashmir Saivaism.
Chattopadhyaya, S.—Evolution of Hindu Sects.
Childe, V. Gordon—The Aryans.
Conze, Edward—Prajnaparamita Literature.
Cowell, E.B.—Jataka Stories.
Dasgupta, S.B.—Obscure Religious Cults.
Dawson, J.—Classical Dictionary of Hindu Mythology.
Dharmasastras (Aryadharmashastra editions)
Eggeling, J.—Satapatha Brahmana.
Fausball, V.—Jataka Stories.
Haraf Prakashani—Rigveda.
,, ,, —Atharvaveda.
Hastings, J.—Encyclopaedia of Religion & Ethics.
History & Culture of Indian People (Bhavan)
Iona Veronica—Indian Mythology.
Kane, P.V.—List of Tantras.
Kramer, S.N.—Sumerian Mythology.
Levi, Sylvan—Pre-Aryan & Pre-Dravidian in India.
Macdonell & Keith—Vedic Index.
Malasekhar, G.P.—Dictionary of Pali Proper Names.
Mallik, Kalyani—Nathapantha. (in Bengali)
Marshall, J.—Mohenjodaro & the Indus Civilization
Possehl, Gregory—Ancient Cities of the Indus.
Puranas. (Aryadharmasastra editions)
Roy, P.C.—Mahabharata.
Sastri, J.L—Ancient Indian Tradition & Mythology.
Sharma, B.—Niruttara Tantra.
Shastri, M.R.—Tantrasara of Abhinaavgupta.
Sampurnananda—Vratyakhanda.
Sharpe, S.—Shiva.
Sur, A. K. —Pre-aryan Elements in Indian Culture.
,, —Dynamics of Synthesis in Hindu Culture.
,, —Sindhusabhyatar Swarup O Avadan (in Bengali)
,, —Banglar Samajik Itihasa. (in Bengali)
,, —Devloker Yaunajiva (in Bengali)
Thakur, A.—Yaska's Nirukta (in Bengali)
Vaidya, P.L.—Mahayana Sutra Sangraha.
Valmiki—Ramayana.
Vyasa—Mahabharata.
Whitney, W.D.—Atharvaveda.
Woodrotfe, J. —Introduction to the Tantras.
,, —Serpent Power.

গ্রন্থকার সম্বন্ধে

ড° অতুল সুর প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি ও নৃতত্ত্ব বিষয়ে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে সুবর্ণ পদক ও পুরস্কার পেয়েছিলেন। Cumlaude সম্মান-সহ জুরিখ থেকে অর্থনীতিতে ডি. এস-সি. উপাধি পান। ১৯৮২ খ্রীস্টাব্দে C.C.I. Award পেয়েছেন।

ওঁর সম্বন্ধে অধ্যাপক বিনয় সরকার বলেছিলেন : "অর্থনীতিতে দুনিয়ার সঙ্গে পাঞ্জা লড়বার জন্য যে ক'জন সাকরেদ তৈরি করেছি, অতুল সুর তাদের অন্যতম।"

ড° দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকার বলেছিলেন : "হিন্দু সভ্যতা যে আর্য ও অনার্য সভ্যতার মিশ্রণে উদ্ভূত, এটা যে চারজন বিশিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ করেছেন তাঁরা হচ্ছেন স্যার জন মারশাল, রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ, ড° স্টেলা ক্রামরিশ ও শ্রীঅতুলকৃষ্ণ সুর।"

ওঁর "চ্যালেঞ্জ অভ্ রুরাল পভার্টি" বইখানা পড়ে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ড° গুনার মিরডাল বলেছেন : "আপনার অর্থনৈতিক দূরদর্শিতা অত্যাশ্চর্য।"

ওঁর "সেভিংস অ্যাণ্ড ইনভেস্টমেন্ট ইন ইণ্ডিয়া" বইখানা পড়ে জহরলাল নেহেরু বলেছিলেন : "বইখানা আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে।"

ওঁর "নিউ ইসু মার্কেট" বই পড়ে বিশ্বব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট ইউজিন আর. ব্ল্যাক বলেছিলেন : "বইখানা বাধ্যতামূলকভাবে সব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো উচিত।"

ইন্টারন্যাশানাল ফিনান্স করপোরেশনের প্রেসিডেন্ট আর. এল. গার্নার বলেছিলেন : "বইখানা আমাদের দপ্তরের সকলের বিশেষ কাজে লেগেছে।"

ওঁর "হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার অভ্ বেঙ্গল" সম্বন্ধে ড° কালিদাস নাগ বলেছিলেন : "বাঙ্গালার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে তোমার পাণ্ডিত্য অনন্য-সাধারণ।"

আচার্য ড° প্রবোধচন্দ্র সেন বলেছেন : "ইংরেজি ও বাংলায় আপনার লেখনী চালনার সমান অধিকার দেখে আপনাকে 'সাহিত্যের সব্যসাচী' নামে অভিহিত করা চলে। আমার অনেক গুরু, তাঁদের মধ্যে বোধ হয় আপনার স্থানই সর্বোচ্চ।"

ড° নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন : "পাণ্ডিত্যের অভিমান নেই, আত্মপ্রচার নেই, নীরবে বাঙ্গালা দেশ ও বাঙ্গালীর সামাজিক ইতিহাস আপনি উদঘাটিত করে চলেছেন। আপনি আমার মত অনেকেরই শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন, আপনার কর্মের দ্বারা।"